# জ্যোতিষীর ডায়েরী

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাচার্য

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬২

দু টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
৯, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১

## ভূমিকা

জ্যোতিষীর ডায়েরী নিছক দিনলিপি নয়, আবার কল্পনাও নয়; সত্যের প্রতিচ্ছবি। এই বইখানিতে যে সকল নাম ও পদবী ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সকল নাম ও পদবী কিন্তু কাল্পিত; নাম ও পদবীগুলির আড়ালে আমি, তুমি, আপনি, তিনি কিংবা সে লুকাইয়া রহিয়াছে। কাহারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য বইখানি লেখা হয় নাই; শুধু আমাদের দৈবনির্ভর সমাজ-মানসের অসহায়তাকে রূপায়িত করা হইয়াছে।

এই বইখানি প্রকাশের মূলে যাঁহার সহৃদয় বন্ধুবাৎসল্যের প্রেরণা রহিয়াছে, জ্যোতিষীর ডায়েরীর পাতার মধ্যে অবশ্য তিনি লুকাইয়া নাই; তিনি জ্যোতিষীর জীবনলিপির পাতায় অক্ষর কাটিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং-এর সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাও এই প্রসঙ্গে সানন্দ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

মহালয়া, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ ;          গ্রন্থকার

# দীক্ষা

পাগলের কথাই ভাবিতেছিলাম।

হ্যাঁ, পাগল বৈ কি? অবস্থার বিপাকে লোকটির মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্রী পাওনাদারদের দুঃসহ পীড়নে নিজের স্ত্রীপুত্রকেও খুন করিতে চায়! পাগল নয় ত কি?

বিকালবেলা নিজের বৈঠকখানায় আরাম করিয়া বসিয়া আছি; পাশে বসিয়া আমার অধ্যাপক বন্ধু সিগারেট টানিতেছেন। সম্মুখস্থ টেবিলে একখানি কাগজের উপর তাঁহার জন্মকুণ্ডলী আঁকিয়া প্রশ্নবাণে আমাকে বিব্রত করিতেছেন। এইরূপ প্রায় নিত্যই ঘটে; নিজের জন্মকুণ্ডলী ও তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক বন্ধুর গবেষণা এই দুই বৎসরেও শেষ হয় নাই; রবি, কেতু ও শুক্রের মধ্যে কে তাঁহার বেশী খারাপ করিতেছে এই জিজ্ঞাসার সমাপ্তি হইল না।

তিনি আবার রত্ন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ; রত্ন ধারণের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস; পরিচিতদের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ-বিসুখ হইলে নিজেই রত্ন কিনিয়া লইয়া গিয়া তাহা ধারণ করিতে বলেন। রত্নের উপর তাঁহার এমন দরদ! এই করিয়া তিনি বহু পয়সা নষ্ট করিয়াছেন; নিজের কোষ্ঠী ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তিনি নিজেই এখন জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; তবুও আমার বিপদ কাটে নাই। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

উদারচরিত্র এই অধ্যাপক বন্ধুটির জন্য সত্যই আমার কষ্ট হয়; ভদ্রলোক বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী তিনি নাকি মস্ত বড় একজন সংগঠক হইবেন; কে এক জ্যোতিষী

এই কথা তাঁহাকে বিশ্বাস করাইয়াছে ; সেইজন্য বড় চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া নিজেই কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হইতেছে ; বেকার, বিপন্ন, পরিচিত ও অপরিচিতেরা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে ; তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী রত্ন ধারণ করিয়া নাকি অনেক মুমূর্ষু প্রাণ পাইয়াছে ; অনেক বেকারের চাকুরী জুটিয়াছে।

অধ্যাপক বন্ধুটি প্রায়ই বিকালবেলা আমার কাছে আসেন ; কোন-কোনদিন তাঁহার জন্মকুণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে আশ্বস্ত করি ; কোনদিন বা হাসিয়া উড়াইয়া দেই ! আজ রসিকতা করিয়া বলিলাম, 'নিশ্চয়ই শুক্র খারাপ, নতুবা আপনার বিয়ে হ'ত !'

প্রৌঢ় বয়সেও তিনি অবিবাহিত ঃ আমার হাসিঠাট্টা কিংবা রসিকতা তিনি গায়েও মাখেন না ; শুধু একই প্রশ্ন—'আচ্ছা হীরা ধারণ করলে কেমন হয় ?'

উত্তরে বলিতে হয়—'ধারণ করে দেখুন।'

তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, 'তা কি আর না করেছি ; এই দেখুন।'—দেখিতে পাই, তাঁহার ডানহাতের আঙ্গুলে হীরার আংটী জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

এইরূপ আলোচনায় হঠাৎ বাধা পড়িল ঃ আধময়লা কাপড় পরনে, এবং খালি পায়ে এক মোটাসোটা লোক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ; লোকটি আমার সন্ধান করিল। আমি বলিলাম, 'কি চাই ? এই আমিই—।'

হুড়মুড় করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া লোকটি আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিল ঃ হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতেছে ; তাঁহার চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল। আমার ভয় হইল ! রাস্তার কোন পাগল হয়ত ঘরে ঢুকিয়াছে। পাগল কাঁদিতেছে ঃ

আমায় বাঁচান ! আমি খুন করব ! খুন করব ! ছেলে মেয়ে স্ত্রীপুত্রের রক্ত খেয়ে নিজে আত্মহত্যা করব। আর ওই পিশাচদের আগে খুন ক'রে গায়ের জ্বালা মেটাব—আমার সর্বস্ব গিয়েছে ! দেনার দায়ে আমার সর্বস্ব গিয়েছে ! রক্ত, রক্ত—রক্ত—

অসংলগ্নভাবে পাগল কত কি বকিয়া যাইতে লাগিল ; আমি ত বিপদ গনিলাম ; পা ছাড়াইতে পারি না। 'পা ছাড়ুন, আগে আপনার কথা শুনি, তারপর কি করতে পারি দেখি'—কিন্তু পাগল শুনে না। অধ্যাপক বন্ধুটি ভয়ার্ত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম।

'বাড়ী গিয়েছে ঃ তবুও পিশাচদের ঋণ শোধ হল না ; এখন দোকানে ধাওয়া করছে ঃ রোজ সন্ধ্যায় নগদ টাকা বের করে দিতে হয় ! আর পারি না। এবার দোকানও যায়, ব্যাটাদের এবার খুন করব।'

প্রায় পনেরো মিনিট পাগল আবোল তাবোল বকিয়া চলিল ; মোটামুটি নানাভাবে জেরা ও প্রশ্ন করিয়া এইটুকু উদ্ধার করা গেল যে, ভদ্রলোকের বড় মুদিখানা ছিল ; নানা কারণে সুদে টাকা ধার নেওয়ায় সেই টাকা পরিশোধের অন্য উপায় না থাকায় বাড়ী বিক্রি করিতে হইয়াছে ! এখন ছেলেমেয়ে লইয়া এক বস্তীতে আছেন। আগের দোকান আর নাই ; ছোট একখানি দোকান করিয়াছেন ঃ কিন্তু পাওনাদারেরা সন্ধ্যায় আসিয়া যাহা থাকে তাহা লইয়া যায় ! ভয়ে তাহাদের টাকা দিতে হয় ; সুতরাং এই ভাবে আর কতদিন চলে ?

পাগলের কান্না আর থামে না। সত্যিই কি লোকটি পাগল হইয়া গিয়াছে ; আমার পা-দুইখানি যে কিছুতেই ছাড়ে না।

'আমায় বাঁচান ; আপনার অপার করুণা ; আমায় বাঁচাতে হবে ; নয়তো এখানেই আমি আত্মহত্যা করব।'

'কে এই আপদকে আমার কাছে পাঠাল ? এখন কি করে এর হাত থেকে নিস্তার পাই ?' বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়িলাম।

মনে মনে প্রশ্ন জাগিল, 'আমি কে? কে এই পাগল আমার পায়ে মাথা রেখে কাঁদছে; সত্যই আমি কে?—আমি জ্যোতিষী; ভৃগু-পরাশর-বশিষ্ঠের প্রতীক আমি। আমাদের অঙ্গুলি-হেলনে গ্রহ-নক্ষত্র চালিত হয়। আর্যাবর্তে আমাদের অতুল প্রভাব! আমাদের তপোবলে নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়। বিধাতার বিধিলিপি আমরা খণ্ডন করতে পারি। পঞ্চপাণ্ডবের আমরাই শিক্ষক! রঘুপতি রাঘবের আমরাই শিক্ষাগুরু। রাজরাজড়ার স্বর্ণমুকুট একদিন আমাদের পায়ে লুটাইয়াছে। আমরা বিধিলিপি খণ্ডন করতে পারি। গ্রহনক্ষত্র আমাদের কথা শুনে।'—আমি যেন আজ নূতন দৃষ্টি পাইলাম: আমি জ্যোতিষী: সংসারের জটিলতায় বিপন্ন মানব আমার পায়ে লুটাইতেছে। আর আমি? আমি মানুষের অদৃষ্ট লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছি; ভুয়া কবচ-মাদুলি ও শান্তিস্বস্ত্যয়ন আমাদের সম্বল! আমরা কোথায়?—

মাথার উপরে ঠাকুর পরমহংসদেবের একটি বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে: নিতান্ত আকস্মিক ভাবে সেই ছবির দিকে দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ পাগলকে বলিলাম, 'আমার পা ছাড়, ওঠ, ঐ দেখ—ঠাকুর; ঠাকুরকে প্রণাম কর।'

পাগল পা ছাড়িয়া উঠিল: 'ঠাকুর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ! আমাকে বাঁচাও ঠাকুর!'—পাগল কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমাকে দয়া করবেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, ওই সব খুনজখমের কথা কখনও মুখে আনবে না। এক্ষুণি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর সাধনক্ষেত্রে প্রণাম জানিয়ে বাড়ী চলে যাও। কোন ভয় নেই।"

অভিভূতের মত পাগল বলিল, 'হ্যাঁ, ঠাকুরের আদেশ পালন করব। আমি চললাম।'

পাগল চলিয়া গেল। অধ্যাপক বন্ধুটি ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন। আমার আর কিছু ভাল লাগিতেছিল না। কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ রহিলাম।

মাসখানেক পর পাগল আবার আসিয়াছিল—কিন্তু হাসিমুখে, বিজয়ার প্রণাম করিতে।

# ছেলে-হারানো ছড়া

## এক

অনেকদিন আগের কথা !

ছেলে হারায় নাই ; ছেলে পলাইয়াছে। কোথায় গেল, কি হইল ! ভয়ানক দুশ্চিন্তা। মাসী-পিসী, মামা-মামী, বন্ধুবান্ধব পরিচিতের সংখ্যা ত কম নয় ; কোথায় কাহার বাড়ীতে গিয়াছে ? কত খবর করিব ? চৌদ্দ-পনের বৎসর তাহার বয়স। দুর্ভাবনাও অনেক। প্রায়ই কাগজে দেখি, কোথায় কাহার ছেলেকে আন্তঃপ্রাদেশিক দস্যুদল হরণ করিয়াছে। অজ্ঞাতনামা কোন ছেলের মৃতদেহ কোন্ স্টেশনে পাওয়া গিয়াছে। প্রাণমন শিহরিয়া উঠে ! জ্যোতিষের চর্চা করি। পৃথুযশা, ভৃগু-পরাশর ঘাঁটাঘাঁটি করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। চররাশিতে লগ্নপতি ও কর্মপতি রহিয়াছে ; কর্মপতির দশায় ছেলে ঘুরিয়া বেড়াইবে। বন্ধুদের মধ্যে বা হিতৈষীদের মধ্যে যাঁহারা জ্যোতিষের চর্চা করেন, তাঁহারাও এই সান্ত্বনা দেন : 'তোমার ছেলে নামকরা লোক হবে ; নিশ্চয় ফিরে আসবে ; ঐ চন্দ্রটা স্থির রাশিতে এ'ল বলে !'

ছেলের এক মামা আসিয়া বলেন, "আমাদের আপিসে একজন তান্ত্রিক আছেন ; তিনি আগামী অমাবস্যায় শ্মশানে বসে তোমার ছেলের গতিবিধি জেনে নেবেন ; তান্ত্রিক-প্রক্রিয়ায় তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনবেন, এরূপ আশ্বাস তিনি দিয়েছেন।"

মন্ত্রতন্ত্র কিংবা শ্মশান-সাধনার কথা অনেক শুনিয়াছি। জ্যোতিষ চর্চা করি বটে, কিন্তু এইরূপ মন্ত্রতন্ত্রের চর্চা করি নাই ; তন্ত্রসারাদি গ্রন্থ ঘাটিয়া দেখিয়াছি, এইরূপ তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া আয়ত্ত করাও আমার

ধারণার দুঃসাধ্য। তবুও ছেলেমেয়ের পিতা আমি, মনটা দুর্বল হইয়া পড়ে ; ছেলেটা গেল কোথায় ?

ইতিমধ্যে ছেলের সেই মামা আমাকে চিঠি ছাড়িলেন ; '...আমাদের তান্ত্রিক শ্মশানে বসিয়া দিব্যদৃষ্টিতে তোমার ছেলের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন ঃ কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। তোমার ছেলে এক মহাপুরুষের আশ্রয়ে আছে। সে এখন অনেক দূরে—সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বন করেছে। তবে সেই মহাপুরুষের আদেশে তিনমাস পর তোমাদের অনুমতি লইতে একবার গৃহে ফিরিবে। সাবধান, ছেলেকে অনুমতি দিতে অন্যথা করিও না।—'

চিঠির কথা বাড়ীতে গোপন রাখিলাম। গৃহিণী ত কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল ! আজ সাতদিন বাড়ীতে কাহারও রীতিমত আহার-নিদ্রা নাই ! ছোট মেয়েটি 'দাদা কখন ফিরবে ?'—বারবার এই প্রশ্ন করে। আমারও মনটা দমিয়া যায়। কেবলই মনে হয়, এখনই হয়ত ছেলে ফিরিবে ! প্রত্যহ দুই তিনখানি করিয়া খবরের কাগজ কিনি। যদি কোন খবর থাকে ! মাঝে মাঝে বীভৎস খবর দেখিয়া শিহরিয়া উঠি।

গৃহিণীর ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠে। পাশের বাড়ীর তাঁহার পাতানো দিদিমণি বলেন, "চল না বোন, আমাদের তান্ত্রিক-বুড়োর কাছে ওপাড়ায় ; উনি অনেক কিছু করতে পারেন। আমাদের বাড়ীতে যখন চুরি হয়েছিল, তখন কি কি জিনিস কখন গিয়েছে, কে নিয়েছে—সব বলে দিয়েছিলেন। তারপর আমাদের বাড়ী বেঁধে দিয়ে যান ; আর চুরি হয় না।"

গৃহিণী, দিদিমণির কথায় আকাশের চাঁদ যেন হাতে পাইলেন। আমাকে অনুমতি দিতে হইল ! ছেলের মামার তান্ত্রিকের দিব্যদৃষ্টি তখন আমার মাথা গুলাইয়া দিয়াছিল ! জানিনা কি হয় ? দিদিমণি

বলিলেন, '৩।৵৫ তিন টাকা সোওয়া ছয় আনা প্রণামী দিতে হয়।' বুড়ো-তান্ত্রিকের প্রণামী ও ইঁহাদের দুইজনের যাতায়াতের গাড়ীভাড়া বাহির করিয়া দিলাম।

দ্বিপ্রহরে দিদিমণি আমার গৃহিণীকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল; ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের কেহ কেহ আসিয়া ছেলে ফিরিয়াছে কিনা অথবা কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিনা জানিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। 'এক্ষুণি এক শিশি মধু চাই; সাধুবাবা (অর্থাৎ বুড়ো-তান্ত্রিক) বলেছেন, কোন ভয় নাই; ছেলে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে আছে, এই শিকড়টা দিয়েছেন, এক শিশি মধুতে ডুবিয়ে তা দরজার মাথার কুলুঙ্গীতে রাখতে হবে। তিন দিনে ছেলে ফিরে আসবে।'

মধু সংগ্রহ করিতে দোকানে ছুটিতে হইল; মধুর শিশিতে তান্ত্রিকের দেওয়া শিকড়টি ডুবাইয়া যথানির্দেশ রাখা হইল! মনে মনে ভাবিলাম, 'হয়ত, এতে উপকার হবে।' দুইদিকে দুই তান্ত্রিকের লড়াই তখন আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে! ছেলের একি মতিগতি হইল!

পরদিন দুপুরবেলা ঘরে বসিয়া আছি; সহানুভূতি জানাইতে দুই-একজন আত্মীয় বন্ধুও আসিয়াছেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত; যদি ডাকে কোন চিঠিপত্র আসে! পাড়ার শ্যামুদাদা এক কাপালিকের গল্প জুড়িয়া বসিলেন; তাঁহার মামাতো ভাইয়ের শালার ছেলেকে নাকি দশ বৎসর আগে এক কাপালিক মন্ত্রবলে হরণ করিয়াছিল; মেদিনীপুরের জঙ্গলে অনেক কষ্টে ছেলেটির সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন নাকি ছেলেটির পূর্বস্মৃতি লোপ পাইয়াছিল; পনেরো দিন হাসপাতালে রাখার পরেও তাহার স্মৃতি ফিরিয়া আসে নাই। তারপর দৈবক্রমে হরিদ্বারের এক মহাপুরুষের কৃপায় ছেলেটির পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া

আসে। ছেলেটিকে নাকি দেবী প্রচণ্ডচণ্ডিকার নিকট বলি দিতে নেওয়া হইয়াছিল, দৈবই ছেলেটিকে রক্ষা করিয়াছে। কাপালিক প্রচণ্ডচণ্ডিকার পূজাদি সাঙ্গ করিয়া বলি দিতে উদ্যত হইয়াছে, ঠিক এমন সময় কোথা হইতে একটি বাঘ বাহির হইয়া কাপালিকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ; বাঘটি কাপালিকের ঘাড়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়া ধরিয়া তাহাকে লইয়া পলাইয়া গেল ; ছেলেটি হতচেতন হইয়া রহিল! বাঘকে তাড়া করিয়া একদল লোক ওইদিকে আসিতেছিল! তাহারাই ছেলেটিকে দেখিতে পায়।

শ্যামুদাদার গল্প শুনিয়াও দৈবের উপর ভরসা করিতে পারিলাম না ; গৃহিণীর চোখে ত ধারা বহিতে লাগিল। এমন সময় ডাকপিয়ন আসিল ; ডাকপিয়ন হইলেও ভদ্রব্রাহ্মণ সন্তান! কয়েকদিন ধরিয়াই তিনি আমাদের ভাবান্তর বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিতেছেন। আজ সঙ্কুচিতভাবে উহার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাঁহাকে আমার ছেলে পালানোর ব্যাপারটা বলিলাম। সব কথা শুনিয়া ডাকপিয়ন বলিল, 'আমাকে একটা আসন ও কিছু গঙ্গাজল দিন। দেখি আমি কি করতে পারি!'

চিঠিপত্র ব্যাগ-ব্যাগেজ একপাশে রাখিয়া ডাকপিয়ন একখানি কম্বলাসনে বসিল, গঙ্গাজল ছিটাইয়া বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র বলিল ; প্রায় দশ মিনিট চোখ মুদিয়া ধ্যানস্থ মতন হইল। তারপর আসন হইতে উঠিয়া ডাকপিয়ন বলিল, 'কোন চিন্তা নাই, বিকালে আমি খবর নিয়ে যাব।'

গৃহিণী ডাকপিয়নের পদধূলি লইলেন, 'কি হবে বাবা, আমার ছেলে কি আজ ফিরবে?'

হাসিমুখে ডাকপিয়ন বলিল, 'নিশ্চয়ই মা, আমার গুরু সাড়া দিয়েছেন।' ডাকপিয়ন চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার প্রায়

আধঘণ্টা পর বন্ধুবর দাসমহাশয়ের বাড়ীর দরোয়ান হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "এইমাত্র আমাদের বাবুর কাছে ফোন এসেছে, আপনার ছেলে হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ; এক ভদ্রলোক দেখতে পেয়ে ফোন করেছেন। এক্ষুণি স্টেশনে যান।"

ছেলের এক বন্ধু আর এক মামা হাওড়ায় ছুটিলেন ; সত্যই ছেলে বাড়ী ফিরিল। ছেলে মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করে নাই ; মাসীর আশ্রয়ে দিব্বি আরামে ছিল। এখন কৃতিত্বটা কাহার ?—ডাকপিয়নের না বুড়ো-তান্ত্রিকের বুঝিতে পারিলাম না।

অবশ্য উভয়েই আমাদের নিকট প্রায় মহাপুরুষ পর্যায়ে উন্নীত হইলেন।

দুই

আবার ছেলে পলাইয়াছে ; বুড়ো-তান্ত্রিকের নিকট গৃহিণী ছুটিয়া গেলেন ; তিনি বলিলেন, 'একবার তোর ছেলেকে এনে দিয়েছি মা, এবার বড় শক্ত ব্যাপার! চৌদ্দ জোড়া জোড়-সুপুরি, আটাশ-টুকরা কাঁচা হলুদ আর বিষকচুর পাতা একখানি লাগবে। আজই নিয়ে আসবে।' অবশ্য এবারও গেট-ফি বা প্রণামী ৩।৶৫ তিন টাকা সোওয়া ছয় আনা লাগিয়াছিল। ইঁহারা নাকি পুরুষানুক্রমে তন্ত্রসিদ্ধ ঃ বর্তমানে পিতা ও পুত্র দুই পুরুষ তান্ত্রিকমতে লোকহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন!

কলিকাতার চৌদ্দটি মার্কেট ঘুরিয়াও চৌদ্দ জোড়া ত দূরের কথা একটিও জোড়-সুপুরি যোগাড় করা গেল না ; সুপুরির খোঁজে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল! ছেলের চাইতে এখন সুপুরির চিন্তাই প্রধান হইল! অগত্যা আবার বুড়ো-তান্ত্রিকের কাছে ছুটিতে হইল ;

তিনি বলিলেন, 'সবই মা প্রচণ্ডচণ্ডিকার ইচ্ছা!' আচ্ছা, বাকী জিনিসগুলো নিয়ে আসুন।' বুড়োর মুখে শ্যামুদার সেই প্রচণ্ড-চণ্ডিকার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম!

এইবার বিষকচুর পাতা! তাহাও অতিকষ্টে তিনচারি দিনে একটাকা মূল্যে পাওয়া গেল। হলুদের টুকরা ও বিষকচুর পাতা বুড়ো-তান্ত্রিকের দরবারে হাজির করা হইল! তিনি সেগুলি হাতে লইয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন; তারপর বলিলেন, 'এগুলি গঙ্গায় ফেলে দিও, ছেলেকে টেনে নিয়ে আসবে।'

আরও তিন দিন কাটিয়া গেল! ছেলে ফিরে না; ডাকপিয়ন এইবার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান; আশ্বাস দেন, 'ভয় নেই; আমার গুরুর দরবারে নিবেদন করে দিয়েছি!'

অবশ্য ডাক-পিয়নের এবম্বিধ অলৌকিক ক্ষমতার কথা ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে অনেকখানি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ চিঠিপত্র বিলির কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনিও তান্ত্রিক-ক্রিয়াকর্মে আত্মোৎসর্গ করিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন; সকালে-বিকালে তাহারও বাসস্থানে ভিড় হয় শুনিলাম।

ডাকপিয়ন আর বুড়ো-তান্ত্রিকের উপর আর নির্ভর করিয়া থাকা যায় না; দশবারো দিন হইয়া গিয়াছে। বিষম দুর্ভাবনায় পড়িলাম। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়া ভাবিতেছি: ছেলেটি এরকম বারবার পলাইয়া গিয়া পড়াশুনার ক্ষতি করিতেছে। এমন সময় আমার এক অধ্যাপক-বন্ধু আসিয়া বলিলেন। 'একটা খবর পেয়েছি; দক্ষিণপাড়ায় এক ফকির থাকেন; তিনি নাকি দৈববলে এইরূপ হারানো ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে আনতে পারেন; এমন কি কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহাও আপনার চোখের সামনে সিনেমার ছবির মত দেখিয়ে দেবেন।'

অধ্যাপক-বন্ধু আমাদের অত্যন্ত হিতৈষী ব্যক্তি। তিনি নিজেও

জ্যোতিষচর্চা করেন। তাঁহার নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া সন্ধ্যার সময় দক্ষিণপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বর্ষাকাল ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; ফকিরের নিকট যাইবার আগে তাঁহার এক শাগরেদ কোন এক দত্তবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। বৃষ্টির ঝাপসা-অন্ধকারে দত্তমহাশয়ের বাড়ী এক গলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ কষ্ট হইল। দত্তমহাশয় সবকথা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি; কিন্তু একটা কথা, আপনি ফকির-সাহেবের ঠিকানা কাউকে বলতে পারবেন না।'

তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় দত্তমহাশয় বলিলেন, তিনি ফকির; সংসারের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই; লোকে গিয়ে বিরক্ত করবে, এটা তিনি চান না! তবে আমার খাতিরে দু-চারজনের কিছু কিছু উপকার করে থাকেন: পয়সাকড়ি লাগেনা; তবে কাজ সিদ্ধ হ'লে পাঁচটি ফকিরকে ভোজ দিতে হয়।' কথা দিলাম; দত্ত মহাশয় আমার সঙ্গে চলিলেন; নানা গলিঘুঁজি ভাঙ্গিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় এক জায়গায় পৌছিলাম; কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা বুঝিবারও উপায় নাই অদূরে একটি পানবিড়ির দোকানে বেশ ভিড় জমিয়াছিল; তাহা দেখাইয়া দিয়া দত্তমহাশয় বলিলেন, 'ঐখানেই ফকির-সাহেব আছেন।'

নিকটে গিয়া দেখিলাম, পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন ঝাঁকড়া-চুল রোগা এক ব্যক্তি; ভিতরে বসিয়া একটি ছেলে পানের খিলি মুড়িয়া বিক্রি করিতেছে। ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া দত্ত-মহাশয় বলিলেন, 'ইনিই ফকির সাহেব!' সেলাম করিলাম। দত্ত মহাশয় আমাদের আগমনের কারণ বলিলেন; ফকির-সাহেব তখন বিড়ি বাঁধিতে ব্যস্ত! সবকথা শুনিয়া আধা বাংলা, আধা উর্দুতে বলিলেন, 'সব কুছ ঠিক হোয়ে যাবে।'

ঝমঝম করিয়া জোর বৃষ্টি আসিল ; অগত্যা বিড়ির দোকানের সেই খুপরীতে আশ্রয় লইতে হইল। ফকির-সাহেব ছেলের নাম ও বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন ; তারপর সিগারেটের পুরাতন খোল লইয়া তাহার ভিতরের পাতলা কাগজ একখানি বাহির করিয়া চক্রাকারে কি আঁক-জোঁক কাটিলেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লাড়কাকে দেখনা চাইয়ে!' দত্তমহাশয় বলিলেন, 'ছেলেটি কি অবস্থায় আছে দেখতে চাইলে এক্ষুণি দেখতে পারেন!' আমার একটু ভয় হইল ; কি জানি কি দেখি! আমি বলিলাম, 'না, আপনি শুধু আমার ছেলেটিকে ফিরিয়ে আনুন।'

ফকির-সাহেব অনুগ্রহ-ব্যঞ্জক হাসিতে বলিলেন, 'ঠিক আছে।' তারপর দুই টুকরা চিরকুট আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'বাড়ী গিয়ে তিনটো ইঁট চাপা দিয়ে একঠু কাগজ রাখনা চাহিয়ে ; আর একঠু বাহির মে উঁচু জায়গামে লেইকে আটিয়ে দেনা। তিন রোজকা অন্দর লেড়কা ফিরবে।'

ফকির-সাহেবকে ঘন ঘন সেলাম ঠুকিলাম ; তিনি কাজে পীর হইলেও ব্যবসায়ে পীর নহেন ; কোথায় এক সরকারী আপিসে চাকুরী করেন ; ইংরেজীও কিছু জানেন। লম্বা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরেন। আদতে তিনি পাঞ্জাবের লোক হইলেও ছোটবেলা হইতে বাংলার মাটীর গুণে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন ; বিড়ির দোকানটা তাঁহারই ; কাছেই তাঁহার আস্তানা! বারবার ফকিরসাহেব বলিয়া দিলেন, কাহাকেও যেন তাঁহার ঠিকানা না দেই ; কিংবা তাঁহার নাম না বলি! আজ হইতে আমি তাঁহার দোস্ত হইলাম ; কোনদিন কোন বিপদে পড়িলে যেন তাঁহার শরণ লই। দত্তমহাশয় বলিলেন, চাকুরীপ্রার্থীর দরখাস্ত ফকির-সাহেব মন্ত্রপূত করিয়া দিলে চাকুরী একেবারে অনিবার্য! এইরূপ শত শত লোকের চাকুরী হইয়াছে। দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইতেও তিনি পারেন।

এইরূপ গুণীলোক নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন; ইহাতে বিস্মিত হইলাম! তাহা-হইলে লোকের উপকার হইবে কি প্রকারে? ফকিরসাহেবকে নিজের কৌতূহল নিবেদন করিলাম। ফকিরসাহেব বলিলেন, 'আপকো মাফিক দোস্ত অনুরোধ করলে সে আমি রাখব। যদি কেউ চায়, লিয়ে আসবেন।'

ফকিরসাহেবের নিকট বিদায় লইতে অনেক রাত হইয়া গেল! বাড়ী ফিরিয়া ফকিরসাহেবের নির্দেশ পালন করিলাম। তিন রোজকা অন্দর অবশ্য ছেলে ফিরে নাই; চারদিনের পর ফিরিয়া আসিল। এইবার আমার এক দারোগা ভায়রা-ভাইয়ের বাড়ীতে ছিল। ফকির-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া এই খবর দিলাম; তিনি খুশী হইলেন এবং একদিন আমার বাড়ীও আসিলেন। ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "দোষ একদম কাট গিয়া; আর পালাবে না।"

ছেলেমেয়ে হারানো ত কলিকাতার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা! এইরূপ দুই-একজন বিপন্ন ভদ্রলোককে লইয়া ফকিরসাহেবের নিকট আরো দুই-একবার গিয়াছি; ফলও হইয়াছে বলিতে পারি। কিন্তু আর এক ভদ্রলোককে চিঠি দিয়া পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন; ফকির-সাহেব শিন্নির জন্য পাঁচটা মুরগি ও পাঁচ সের চাল আর আনুসঙ্গিক খরচপত্রের জন্য পাঁচসিকে পয়সা চাহিয়াছেন। ভদ্রলোক অবশ্য সবই দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ছেলেকে ছয়মাস পরে পাওয়া গেল! তারপর আর একবার ফকিরসাহেবের আস্তানায় গিয়াছিলাম—সেই বিড়ির দোকানে। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান দিতে পারিল না! কেহ কেহ বলিল, ফকিরসাহেব এই রকম মাঝে মাঝে পাঁচ-সাত-দশ বৎসর অদৃশ্য হইয়া পড়েন!

তিন

আর একবার ছেলে পলাইয়া গেল ; এইবারে আর কোন চেষ্টা-চরিত্র করিলাম না ; ভাবিলাম কোথায় কোন্ মাসী-পিসীর বাড়ীতে গিয়াছে, কয়েকদিন পর ফিরিয়া আসিবে। গৃহিণীকে বলিলাম, কোন চিন্তা নেই ; ঠিক দেখবে আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়ে কোন মাসীর বাড়ী থেকে ফিরে আসবে ; মাসীর সংখ্যা ত কম নয় ! তোমার নিজের বোন, আর মাসীমার মেয়েদের নিয়ে একুশ জন বলেছিলে না !' ছেলের মাসীভাগ্য গণনা করিয়া মনে মনে হাসিলাম। এই কলিকাতা শহরেই ছেলের আটজন মাসী ছড়াইয়া আছেন ; কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা !

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল ; তবুও ছেলের দেখা নাই ; একটু চিন্তাও হইল। দুই-এক জায়গায় চিঠিও লিখিলাম, কিন্তু ছেলের কোন সন্ধানই মিলিল না। খবরের কাগজের বিচ্ছিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর পড়িয়া উৎকণ্ঠা বাড়িয়া যায়। ছেলের রাশিচক্রটা চোখের সম্মুখে ভাসে, কোন মীমাংসাই করিতে পারিনা। বন্ধুবর মিত্রমহাশয় বলিয়াছেন, কেতুর প্রতিকার করুন। ইতিমধ্যে পণ্ডিতবন্ধু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ষড়দর্শনতীর্থ মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কেতুর জপ-পূজাদিও করিলাম। দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল ; ছেলের কোন খবরই নাই। পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব সকলেই আসিয়া নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন আমার এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হইল ; তিনি সকল ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, 'এক্ষুণি গঙ্গার ঘাটে পণ্ডিত শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করুন ; আমি ভুক্তভোগী মশাই ; শিরোমণির অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ; নাম শুনে ফিরবার দিন ক্ষণ সময় বলে দিতে পারেন।'

এই সম্বন্ধে আমার কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বলিলাম। অধ্যাপক মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, 'ইনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; তাঁহার এটা ব্যবসা নয়, তিনি পয়সা নেন না। আমার ভাগনেটাকে দু' দুবার তিনি এনেছিলেন। অনেক রোগও তিনি ভাল করতে পারেন। আমাদের কলেজের একটি ছাত্রের মৃগীরোগ শিরোমণি একদিনে ভাল করে দিয়েছিলেন। তিন বৎসর কেটে গিয়েছে; ছেলেটা ভালই আছে। অথচ কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

এইবার গঙ্গার ঘাটে শিরোমণি পণ্ডিতের পালা। বিকাল বেলা লাল রঙের একখানি পুরাতন দোতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম: প্রায় শতখানেক লোক অপেক্ষা করিতেছে; শিরোমণি মহাশয় ছোট্ট একটি কুঠরিতে বসিয়া আছেন; দুইজন তিনজন করিয়া লোক ঘরে প্রবেশ করিতেছে! আর দুই তিন মিনিট অন্তর বাহির হইয়া আসিতেছে। আমিও এক ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িলাম; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; আশীর উপর বয়স হইবে; ঘন ঘন নস্যি টানিতেছেন; একখানা লম্বা খাতা লইয়া পেন্সিলে আঁকজোঁক কাটেন; একজনকে বলিলেন, কি চাই বাবা!' ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'আমার ছেলের অসুখ।' শিরোমণি বলিলেন, 'কি নাম?'

নাম শুনিয়া শিরোমণি নামটি লিখিলেন; তারপর তিন-চার, পাঁচ-ছয়' বলিয়া কি যোগ-বিয়োগ করিয়া বলিলেন—'মাথা খারাপ হতে যাচ্ছে: মাদুলি লাগবে, ৯।৶৫ নয় টাকা সোওয়া ছয় আনা। এনেছ, দাও।'

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ টাকা বাহির করিয়া দিলেন; টাকা লইয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, কাল একাদশী; আগামী মঙ্গলবারে এমনি সময় মাদুলি নিয়ে যেয়ো।' ভদ্রলোক বিদায় হইলেন।

আমি আমার সেই অধ্যাপক মহাশয়ের পরিচয় দিয়া আমার কথা নিবেদন করিলাম; তিনি যথারীতি সব জানিয়া লইয়া একটি টিনের

বাক্স খুলিয়া একটি মাতুলি দিয়া বলিলেন, 'ছেলের মায়ের বাঁ হাতে আজই পরিয়ে দিও। আজ মঙ্গলবার; বিষ্যুৎবার সন্ধ্যার সময় ছেলে ফিরবে। আমায় জানিয়ে যেয়ো।'

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি ত টাকাকড়ি আনি নাই; মাতুলিটার দাম—" তিনি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আমি মাতুলির কারবার করি না। ওটার দাম লাগবে না। যাও, বউমার হাতে পরিয়ে দাওগে।'

শিরোমণি মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মাতুলি ধারণ করানো হইল। ছেলেও ফিরিল। কয়েকদিন পর ছেলেকে লইয়া শিরোমণি মহাশয়ের দরবারে আর একবার হাজির হইলাম। শিরোমণি মহাশয় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তুটি মাতুলি লাগবে; একটি রুপোর আর একটি তামার; ২১৷৷০ একুশ টাকা আট আনা; এনেছো, দাও!'

সঙ্গে টাকা ছিল না; আর সেই সময়ে একুশ টাকা আট আনা খরচ করিবার মত সামর্থ্যও আমার ছিল না। শিরোমণি মহাশয়কে বিনীত ভাবে তাহা নিবেদন করিলাম। তিনি আপসোস করিয়া বলিলেন, 'কি করব বাবা, বিনি পয়সায় যা দেবার আমি দিয়েছি; ছেলেকে শক্ত ক'রে বাঁধতে হলে মাতুলি তুটির দরকার হবে। তা' যখন পার নিয়ে যেয়ো।'

শিরোমণি মহাশয়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম; গৃহিণীর তাড়নায় ও মানসিক দৌর্বল্যে অবশ্য মাতুলি তুইটি পরে লইতে হইল। ছেলে আর পলায় নাই; কিন্তু আমার সুপারিশে যাঁহারা শিরোমণি-মহাশয়ের শরণ লইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কবচ মাতুলিতে টাকা-পয়সা খরচ করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে আর দেখা করি নাই!

## ওঁ ক্লীং ওঁ

"হ্যাঁ, একবার কোন কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম বটে, কে একজন অল্পবয়স্ক যুবক ত্রিকালদৃষ্টি লাভ করেছেন ঃ সার্টিফিকেট দিয়েছেন অগ্নিযুগের এক বিপ্লবী-প্রধান। সেই সার্টিফিকেটটাই ছাপা হয়েছিল, বিজ্ঞাপন হিসাবে।"—আগন্তুকের কথায় সে কথা মনে পড়িয়া গেল।

আগন্তুকের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর হইবে ; দেখিলেই মনে হয়, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে ভুগিতেছেন ; চেহারা বিশ্রী হইয়া গিয়াছে।

তিনি বলিলেন, 'আপনার নাম শুনে এসেছি ; অনেকদিন থেকেই ভাবছি, দেখা করব; কিন্তু আর হয়ে উঠে না। এরই মধ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওখানে গিয়েছিলুম ঃ তারপর তিনমাস কেটে গেছে ; আমার একটুও উপকার হয় নাই।'

ভদ্রলোক অল্প পুঁজি লইয়া কাঠের কারবার করেন ; পেটের গোলমালে আজ ছয়-সাত বৎসর ভুগিতেছেন ঃ ডাক্তারি, কবিরাজী, টোটকা-টাটকা কিছুই বাদ রাখেন নাই। কোষ্ঠীবিচার করাইয়া যথাসম্ভব সকল রকম প্রতিকার করিয়াও নিরাশ হইয়াছেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধব্যক্তির সার্টিফিকেট দেখিয়া মুগ্ধ হন ; সেই ত্রিকালদৃষ্টি যুবক নাকি মন্ত্রবলে রোগ সারাইতে পারেন ; অথচ সেই যুবক বৎসর খানেক আগেও আমার কাছে দুই-একবার আসিয়াছিলেন। তিনি যে এরই মধ্যে ত্রিকালদৃষ্টি লাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন—শুনিয়া বিস্ময়বোধ করিলাম। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই!

সেইদিন দাসমহাশয়ের নিকটই শুনিয়াছি ; তাঁহার এক বন্ধুপত্নী ( তিনি আবার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ) নাকি এখন বহুলোকের গুরু-মা হইয়া বসিয়াছেন। লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইচ্ছা

করিলেই অনর্গল বলিতে পারেন। বর্তমানে তাঁহার স্বামীও নাকি পত্নীর অলৌকিক ক্ষমতার গর্বে গৌরব বোধ করেন; এবং বেশ সম্ভ্রম রাখিয়াই কথাবার্তা বলেন। সুতরাং আমার সেই পরিচিত ফুলবাবু যে ত্রিকালজ্ঞ হইবেন, তাহা বিশ্বাস করা চলে।

আগন্তক বলিলেন, 'আমি ত ঠাকুরমহাশয়ের নিকট গেলাম; তিনি আমাকে একটি মন্ত্র দিলেন।* মন্ত্রটি তিনসন্ধ্যা ১০৮ একশো আটবার করে জপতে বললেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, একুশ দিনেই আমার রোগ নির্মূল হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তারপর কি হ'ল! একুশ দিনে কি কোন উপকার হ'ল?'

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'না, কিছুই হয় নাই; বরং আরও বেড়ে গেল; আমি আবার দেখা করলাম; তিনি বল্‌লেন, নিশ্চয় ফল পাবেন: কোন চিন্তা নাই; একুশ দিনের জায়গায় বিয়াল্লিশ দিন কেটে গেল! আমার প্রায় দুশো টাকা জলে গেল।'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, 'তিনি কি আপনার জন্য কোন জপতপ, পূজাহোম করে কবচমাদুলি দিয়েছেন?'

"না, না, তিনি এসব কিছুই করেন না: মন্ত্রটি দিবার সময় ৭২৲ বাহাত্তর টাকা নিয়েছিলেন: তারপর আরো দু'ক্ষেপে প্রণামী দিতে হয়েছে ২৫৲ পঁচিশ টাকা করে, আর মন্ত্রের শক্তি বাড়াবার জন্য তিনক্ষেপে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা নিয়েছেন।"—ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত ও মর্মাহত ভাবে উত্তর দিলেন।

আমি সহানুভূতির সুরে বলিলাম, 'সত্যই আপনার অবস্থা দেখে কষ্ট হয়! একবার যখন কোন ফল পেলেন না, তখন বারবার তাঁকে টাকা দিতে গেলেন কেন?'

আগন্তুক বলিলেন, 'সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না; ওঁর কাছে গেলেই

মনটা কেমন হয়ে যায়! কালই আরো পঁচিশ টাকা চেয়েছিলেন; আমার কাছে তখন মাত্র ১০৲ দশটি টাকা ছিল: তাই দিয়ে প্রণাম করে বললুম, ঠাকুর আমায় মাপ করুন; আর দেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

আগন্তুকের কথায় বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না; মানুষ যখন বিপন্ন হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পায়। রেসে বারবার হারিয়া গিয়াও অনেকে সর্বস্বান্ত হয়, তবুও সময় থাকিতে ফিরে না। আগন্তুক আবার বলিলেন, "এইত আজও সেই ঠাকুরের কাছে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ আপনার বাড়ীর কাছে এসে বাস থেকে নেমে পড়লাম। আপনি আমার একটা উপায় করে দিন।"

আমি ত আর মন্ত্রবিদ্ ত্রিকালঋষি কিংবা তান্ত্রিক নহি। তাঁহার কি উপকার করিতে পারি? একমাত্র কোষ্ঠী-বিচার করিয়া এটা-ওটা প্রতিকার নির্দেশ করিতে পারি! কিন্তু প্রতিকারে সব সময় ত ফল হয় না। ঠিক ঠিক ঔষধ পড়িলেও যেমন সকলক্ষেত্রে রোগ দূর হয় না! এই কথাটাই তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

আগন্তুক তাঁহার কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিলেন; কোষ্ঠী বলিলে ভুল করা হইবে,—রাশিচক্র বিচার করিয়া বিভিন্ন জ্যোতিষী যে সকল প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারই একটা ফিরিস্তি। সূর্যকবচ, মহানবগ্রহ কবচ, গোমেদরত্ন, মুক্তাধারণ—আরও কত কি! আমি জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া বলিলাম, 'পুরোপুরি ভাল হওয়া কঠিন; গ্রহের ফের এমনই যে পেটের গোলমাল কিছু-না-কিছু আপনার থাকবেই।'

আগন্তুক বলিলেন, 'তা হলে কি এর কোন প্রতিকার নেই?'

আমি বলিলাম, 'ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নিন্। গ্রহের প্রতিকার যথেষ্ট হয়েছে; শুধু গোমেদটা রাখতে পারেন।'

তিনি মর্মাহত হইলেন; অর্থাৎ আমার কথা ঠিক মনঃপূত হইল না। জ্যোতিষে প্রতিকার নাই, এই কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন

না ; জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এমনই বিশ্বাস। তিনি বলিলেন, 'দেখুন, আপনাদের মত লোকের কাছেও যদি ঠিক ঠিক ব্যবস্থা না পাই, তাহলে কোথায় যাব ?'

আমি বলিলাম, 'ডাক্তারেরা কি সকল রোগ সারাতে পারেন ? ঠিক ঠিক ঔষধ পড়লেও সব সময় কি রোগ সারে ? তাহলে লোকে অমর হয়ে যেতো !

ভদ্রলোক বলিলেন, 'ঠিক কথাই বলেছেন ! কিন্তু দৈববলে কি না হয় ? গ্রহ বিরূপ বলেই ওষুধে ফল হচ্ছে না। সেই গ্রহদোষ কাটানোর কি কোন উপায় নেই ?'

কাহাকে বুঝাইব ? ভদ্রলোকটির অন্ধবিশ্বাস ভাঙ্গানো আমার পক্ষে কঠিন। বলিতে হইল, 'দেখুন, আপনার ঐ ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুরও ত কিছুই করতে পারলেন না।'

আগন্তুক কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'আমার অদৃষ্ট মন্দ ! নইলে তাঁর দয়ায় কত লোক ভাল হয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই ! সেদিন সেখানে এক ভদ্রলোককে বলতে শুনলাম, তাঁর শালীর কুষ্ঠরোগ পর্যন্ত ঠাকুরের মন্ত্রে একদম ভাল হয়ে গেছে।'

বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কেহ চোখে দেখে নাই, অথচ অপরের মুখে শুনিয়াছে ; এইরূপ সত্য-( ? ) কাহিনীর অভাব নাই। এইত সেদিন আমারই বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোকের একমাত্র মেয়ের কঠিন টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। মেয়েটির শ্বাসকষ্ট উপস্থিত ; ডাক্তার কাছে বসিয়া আছেন। মেয়েটির মা পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ে পড়িলেন : তাঁহার মেয়েকে বাঁচাইতে হইবে ; যুক্তিতর্ক এইস্থলে অচল। বাধ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইল। দৈববল কিংবা অলৌকিক শক্তি আমার নাই ; কিন্তু যেহেতু আমি জ্যোতিষচর্চা করি, এই হেতুও আমার বিপদ : অন্ততঃ মানবতার

খাতিরে সান্ত্বনা দিবার জন্যও যাইতে হয়। মুমূর্ষু মেয়েটির মাথায় ভগবানের নাম করিয়া হাতও বুলাইতে হয়। নতুবা উন্মাদিনী-প্রায় মায়ের ব্যাকুলতা ক্ষান্ত হয় না: 'বাবা, তুমি আমার বাছার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তাহলেই বাছা আমার চোখ খুলবে।' চোখ না খুলিলেও কি জানি কেন, মেয়েটি আরোগ্যের পথে আসে। তাহা আমার স্পর্শগুণে না মায়ের আকুল প্রার্থনায় বুঝিতে পারি না।

এমনি করিয়াই মাহাত্ম্য ছড়ায়: মানুষের ঐকান্তিক কাতর প্রার্থনায় সত্যই কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। নামকরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দুর্বলতাও দেখিয়াছি: তাঁহার রোগেও মন্ত্রপূত জলের দরকার হয়। আর এই আগন্তুক সামান্য কাঠের ব্যবসায়ী! তাঁহাকে বলিলাম, 'তাহলে মন্ত্রটি আরো কিছু দিন জপ করে দেখুন।'

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন, 'তিন মাস হয়ে গেছে, একটু উনিশ-বিশও বুঝছি না! নিশ্চয়ই ঠাকুর কোন ভুল করেছে।'

আমি বলিলাম, 'ভুল করবেন কেন? আর ভুলই যদি করে থাকেন, আবার তাঁকে বলুন না, শুধরে দেবেন।'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'বলেছি,—কিন্তু তাঁর একই কথা 'ওঁ ক্লীং ওঁ'।

আমি বলিলাম, 'এটাই কি মন্ত্র?'

তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, এ মন্ত্রেই কত লোক ভাল হয়ে গেল; আমার কিছুই হ'ল না; জীবনে কি পাপ করেছিলাম জানিনে।'

আমার আর বলিবার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে উপদেশ দিলাম, রোজ সূর্য-উঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যকবচ পাঠ করবেন; তাতে উপকার পেতে পারেন।

তিনি চলিয়া গেলেন। আমি মন্ত্রশক্তি অর্জনের জন্য বৃহৎ তন্ত্রসার ঘাঁটাঘাঁটি আরম্ভ করিলাম।

# বৃহস্পতির সঞ্চার

বৃষ্টি পড়িতেছে ; সকাল প্রায় ৭॥০ টা। চা খাইয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছি ; এমন সময় দরজার সামনে দাঁড়াইল এক পরিচিত কিশোর। পনের-ষোল বছরের ছেলে। কিশোরটি আমার শ্রদ্ধেয় এক অধ্যাপকের বড় ছেলে ঃ অনেক দিন, সম্ভবতঃ মাস ছয়েক তাহাদের বাড়ী যাই নাই কিংবা তাহার বাবার সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। মনে বড় সংশয় জাগিল। এমনভাবে ত কোনদিন ছেলেটি আমার বাড়ী আসে নাই ; ছেলেটির মুখে সর্বদাই হাসি লাগিয়া থাকে, আজ কিন্তু তাহার মুখে হাসি নাই, মুখখানি মলিন ঠেকিতেছে। আমাকে নমস্কার করিয়াই সে বলিল, "আপনাকে এক্ষুণি আমাদের বাড়ী যেতে হবে। বাবা বলেছেন, আপনার কোন কাজের ক্ষতি হ'লেও আমার সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যেতে।"

আমি বলিলাম, "কেন, তোমরা সকলে ভাল আছ ত ? বাবা-মা, ভাই-বোন কেমন আছে ?" বালকটি বলিল, "হ্যাঁ, সকলেই ভাল আছেন। বাবার খুব জরুরী দরকার, সেখানে গেলেই সব শুনতে পাবেন।"

কি আর করি, জরুরী কিছু লেখার কাজ থাকিলেও সংশয়াকুল চিত্তে কিশোরটিকে অনুসরণ করিলাম। পথে আর কোন বিশেষ কথা হইল না। ডিগ্রিটা রহিয়াছে ; মাঝে-মাঝে এইরূপ শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকদের কেহ কেহ ছুটিছাটা লইলে তাঁহাদের জায়গায় আমাকে বসাইয়া যান। ভাবিলাম, হয়ত এইরূপ কোন সুযোগ আসিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন ; এবং আমি জ্যোতিষ-চর্চা করি বলিয়া আমার উপর তাঁহার একটা বিশেষ সহানুভূতিও আছে। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ; সাহিত্যিক সমাজেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাড়ীর তেতলায় অধ্যাপকমহাশয় থাকেন ; অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তেতলায় উঠা গেল : কিশোরটি কড়া নাড়িয়া আমাদের আগমন-বার্তা জানাইলে অধ্যাপকের একটি মেয়ে আসিয়া সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিল। অধ্যাপকমহাশয় শারীরিক ব্যাপারে একটু ভীতু ধরণের লোক ; সামান্য অসুখ-বিসুখেই অস্থির হইয়া পড়েন ; আজ মাথাধরা, কাল স্নায়ুদৌর্বল্য কিংবা রক্তের চাপ কম পড়া প্রভৃতি প্রায়ই লাগিয়া আছে। তিনি শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়া কিংবা তাকিয়া হেলান দিয়াই লেখাপড়ার কাজ করিতে অভ্যস্ত। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি যথারীতি বিছানার উপরই বসিয়া আছেন। আমি হাসিমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম : তিনি কিন্তু ভারাক্রান্ত মনে মৃদু হাসিয়া আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন : "বস ভাই, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, কেমন আছ ?"

আমি উত্তর দিলাম, "ভালই আছি : জানেন ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, একা মানুষ ইচ্ছা থাকলেও সময় করে উঠতে পারি না। যাক, এত সকালে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ; আর খোকা এমন ভাবে আমাকে বলেছে যে, আমি ত ভেবেই আকুল : ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না !"

তিনি আমতা-আমতা করিয়া বিষাদমাখা মুখে হাসি টানিয়া বলিলেন, "আমার শরীরটা কয়দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না ; তাই জরুরী প্রয়োজনে একটা পরামর্শের জন্য তোমাকে ডেকেছি।"

ইতিমধ্যে আমার জলখাবার ও চা আসিল ; ঘরে তাঁহার স্ত্রী, দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাদের সকলকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন ; ছেলেকে বলিলেন, 'দরজা বন্ধ করে দাও, আমি না ডাকলে কেউ যেন ঘরে না আসে।'

সকলে বাহির হইয়া গেল ; বিছানার কাছেই একটি তাকে বইপত্র সাজানো ; তাহার মধ্য হইতে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার কোষ্ঠী বাহির

করিলেন ; আমার হাতে কোষ্ঠীখানি দিয়া বলিলেন, 'দেখ—দেখি, এখন আমার বৃহস্পতির দশায় শুক্রের অন্তর্দশা কি না ?'

আমি কোষ্ঠীখানা খুলিয়া দেখিলাম ; ইহার পূর্বে আরও দুই একবার কোষ্ঠীখানা আমি দেখিয়াছি ; আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, একান্ন বৎসর ছয়মাস তিন দিন বয়স থেকে শুক্রের অন্তর্দশা আরম্ভ হয়েছে ; চুয়ান্ন বৎসর দুইমাস তিন দিনে তা শেষ হবে। আর দুইমাস মাত্র ; আপনার বয়স ত চুয়ান্ন হ'ল।"

তিনি বলিলেন, "কাল শুক্রবার বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় বৃহস্পতির সঞ্চার ঃ আমার কুম্ভরাশি ; পঞ্জিকায় লিখেছে, কুম্ভরাশির গোচরশুদ্ধি ও চন্দ্রশুদ্ধি না থাকায় অতীব অশুভ। আমার কন্যালগ্ন ; সুতরাং সপ্তমপতি বৃহস্পতি এবং দ্বিতীয়পতি শুক্র উভয়েই মারকগ্রহ।"

তাঁহার কথাবার্তায় এতক্ষণে অনুভব করিলাম, দীর্ঘকাল স্নায়ু দৌর্বল্যে ভুগিয়া ভদ্রলোকের মন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজেও কিছু কিছু জ্যোতিষ চর্চা করিয়া থাকেন। আমি উত্তর দিলাম, "বুঝেছি, মারকদশা আর বৃহস্পতির সঞ্চার—উভয়ই বিরুদ্ধ ; তাতে কি হয়েছে ?"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "না ভাই, এসব উড়িয়ে দেওয়া চলে না, আমি বুঝতে পেরেছি—আমার সময় খুব সন্নিকট। এ বিশ্বাসটা কাল আরো দৃঢ় হয়েছে ; গিন্নী কিংবা ছেলেমেয়ে সকলকেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। ভগবানের ইঙ্গিত আমি পেয়ে গেছি ঃ কাল সন্ধ্যার পরই এ ঘটনা ঘটে গেছে।"

আমি চুপ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম ঃ হয় দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, না হয় কোনরূপে যৌগিক ক্রিয়ায় তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়াছেন ; আমার মনে দারুণ কৌতূহল জাগিল। তিনি বলিয়া চলিলেন, "আমার ছেলের প্রাইভেট

টিউটর আছে , সে কি করে, কি পড়ায় তার কোন খবরই আমি রাখি না। কিন্তু কাল সন্ধ্যার পর হঠাৎ ছেলের খাতা উল্টে দেখি, কালই কতকগুলি ইংরেজী বাক্যাংশের সাহায্যে বাক্য রচনা করতে দিয়েছে; তার একটি ছিল;—"Nip in the bud." আমার ছেলে বাক্য তৈরী করেছে,—What a lofty ambition I had, but my father's untimely death nipped it in the bud." অর্থাৎ আমার বড় উচ্চ আশা ছিল, কিন্তু আমার বাবার অকাল মৃত্যুতে তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। এখন বলত, বিধাতার ইঙ্গিত না হলে মাষ্টার ঐরকম বাক্যাংশ দেবেই বা কেন, আর ছেলে এরকম লিখতেই বা যাবে কেন ?"

অধ্যাপক মহাশয়ের কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। এখানে তর্ক করা চলে না। আমি অন্যপথ ধরিলাম ; বলিলাম, "আচ্ছা, বৃহস্পতির সঞ্চার ত শুধু একা আপনার জন্যই নহে। অসংখ্য লোকের কন্যালগ্ন কিংবা কুম্ভরাশি রয়েছে ; আপনি কি মনে করেন, তারা সকলেই একসঙ্গে মরে যাবে ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "না ভাই, ভুলে যেওনা, তাঁদের ত আমার মত মারকদশা পড়ে নাই, আর আমার ছেলের সেই Nip in the bud —বিধাতার ইঙ্গিত ! তা ভুললে চলবে কেন ?"

আমি একটু জোর দিয়া বলিলাম, "বেশ কাল সঞ্চার-দিন বলেই ত আপনার ভয় ! তার দায়িত্ব আমার।"

তিনি বলিলেন, "ছেলেমানুষি করোনা ভাই, কিসে কি হয় বলা যায় না ! সেদিন কাগজে দেখনি কে একজন পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা পড়লেন। জেনেশুনে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি কই ? আমারও একটা কর্তব্য আছে।"

আমি তাঁহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমি বলিলাম,

"ইহাতে আবার করণীয় কর্তব্য কি আছে ? আপনি কি শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাতে চান ?"

তিনি বলিলেন, "না, আমি বুঝতে পেরেছি, এযাত্রা আর আমার নিস্তার নাই ; শান্তিস্বস্ত্যয়নে কোন কাজ হবে না। তবে ছেলেমেয়েগুলি নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়বে ; তার একটা ব্যবস্থা করতে চাই ; আমি মনে করেছি, আজই কলেজের প্রিন্সিপালকে ডাকব ; কোথায় কি দেনা-পাওনা আছে, তার একটা হিসেব রেখে যাব ; প্রভিডেণ্ড-ফণ্ডের টাকা এবং আমার লেখা বইগুলির আয় থেকে মাসে মাসে যা পাওয়া যাবে, তার থেকে প্রবোধ ( অর্থাৎ কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন ) আমার সংসার চালিয়ে দেবে ; সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপরই দিয়ে যাব। আমার বড় ছেলেটি মানুষ হ'তে আরো চার-পাঁচ বৎসর লাগবে।"

আমি শ্রদ্ধেয় এই অধ্যাপকের মনের বিচলিত অবস্থা দেখিয়া হতভম্ব হইলাম ; জ্যোতিষ চর্চা করি বলিয়াই আজ এই বিপদ। আমি এইবার বলিয়া উঠিলাম ঃ "তা অবশ্য ঠিক, আপনার শরীরের যা অবস্থা, কয়েক মাসের জন্য চেঞ্জে গেলে মন্দ হয় না ; আর প্রবোধ বাবুর উপরে নিঃসন্দেহে সকল ভার দিতে পারেন।"

তিনি বলিলেন, "প্রবোধের জোরেই ত বেঁচে আছি ; আর তাঁরই অনুরোধে কলেজের কাজ ছাড়তে পারছি না। তোমার মত যখন হয়েছে, তখন তাকে ডাকি।"

আমি বলিলাম, "দেখুন, আপনার কোষ্ঠীর মারক-কাল সম্বন্ধে কিন্তু আমি মত দিতে পারছি না ; কিংবা বৃহস্পতি আপনার মারকগ্রহ বটে, কিন্তু একটি ছোট ছেলেরও এরূপ বৃহস্পতি-শুক্রের দশা পড়তে পারে, তাহলে কি সে মারা যাবে ? আগে আয়ু বিচার করা দরকার ; অল্পায়ু মধ্যায়ু কিংবা দীর্ঘায়ু বিচার করে তারপরে মারক সময় স্থির করতে হয়।"

অধ্যাপক মহাশয় কিছু ভরসা পাইলেন, “অবশ্য আয়ু-বিচার করা হয় নাই ; কিন্তু আমার ত বয়স হয়েছে।”

আমি বলিলাম, “বয়স হ’লেই যে মারকদশা পড়েছে বলে কাল পরশু মরতে হবে, এমন কোন কথা নাই। শুক্র আপনার দ্বিতীয়পতি হিসাবে মারকগ্রহ বটে, কিন্তু তিনিই আপনার ভাগ্যপতি।”

এইবার একটু উৎসাহের সুরে তিনি বলিলেন, “বুঝেছি ; কিন্তু দোষও রয়েছে ; যখন পরাশর বলেছেন ঃ

অষ্টমং হ্যায়ুষঃ স্থানমষ্টমাদষ্টমং চ যৎ।
তয়োরপি ব্যয়স্থানং মারকস্থানমুচ্যতে ॥
তত্রাপ্যাদ্যব্যয়স্থানাদ্ দ্বিতীয়ং বলবত্তরম্।
তদীশিতু স্তত্রগতাঃ পাপিনঃ তেন সংযুতা ॥

আমার মনে হঠাৎ একটা ফন্দি জাগিল ; অধ্যাপক মহাশয় কবি-মানুষ ; অত্যন্ত অনুভূতি-প্রবণ তাঁহার মন। বিশেষ করে তন্ত্রে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ; কালীকীর্তনাদি শুনিতে তিনি ভালবাসেন। সেই কথা চিন্তা করিয়া বলিলাম, “দেখুন, দ্বিতীয়পতি যে মারক তা আমি স্বীকার করি ; কিন্তু জন্মকুণ্ডলীতে তাঁর অবস্থানটাও দেখতে হবে। তিনি আপনার লগ্নে আছেন ; দিবাভাগে জন্ম হওয়ায় শুক্রই আপনার মাতৃজ্ঞাপক গ্রহ ; মা কি কখনও ছেলেকে বিনাশ করতে পারে!”—একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে।

আমি বলিতে লাগিলাম, “ভাগ্যপতি শুক্রের অন্তর্দশা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার পদোন্নতি হয়েছে ; বাইরের ইউনিভার্সিটিও আপনাকে সম্মান দিয়েছে। এ দু’বছর অনেকখানি সম্মান আপনাকে শুক্র দিয়েছে ; সুতরাং আয়ু শেষ হয় নাই, স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, বরং শুক্রের উপর বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়ায় এরূপ শুভ ফল হচ্ছে।

মৃতসঞ্জীবনীর কারক শুক্র, বৃহস্পতির অমৃত-দৃষ্টিতে নিজের সন্তানকে বাঁচাবার সামর্থ্য শুক্রের রয়েছে।”

অধ্যাপকের চক্ষে অশ্রু আসিল; মায়ের নামে এইরূপ দুর্বলতা দেখা দেওয়ায় আমারই জিত হইল। বাহিরে থাকিয়া অধ্যাপক-গৃহিণী সম্ভবতঃ সকল কথা নেপথ্যে শুনিতেছিলেন; এইবার দলবলসহ দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “দেখ ভাই, কাল কিন্তু এখানে তোমাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে; সকাল সকাল আসবে; গল্পগুজব করা যাবে; উনিও একা-একা বসে ছাইপাঁশ ভাবতে থাকবেন।”

কথা দিলাম। বৃহস্পতির সঞ্চার সময়টাই তাঁহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। অধ্যাপক-গৃহিণীর ধারণা, যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলে ঐ ১২টা ১৩ মিনিটের সময়ই ঘটিবে। অধ্যাপক মহাশয় গুন্ গুন্ করিয়া রামপ্রসাদী গান ধরিলেন—“তিলেক দাঁড়া ওরে শমন—” এত ধীরে যে তাহা শুনিবার উপায় নাই।

পরদিন অবশ্য নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়াছিলাম। সঞ্চারকাল অতিক্রান্ত হওয়ার দুই তিন ঘণ্টা পর অধ্যাপক ও তাঁহার গৃহিণীর আশীর্বাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছি; ইহার পর আরো তিন চারিবার বৃহস্পতির সঞ্চার হইয়া গিয়াছে। মারকদশা আর গণনা করা হয় নাই।

# জ্যোতিষীর বিপদ

একটি ঢাক, একটি কাঁসর আর একটি ঘণ্টা—নিকটে দেবমন্দিরে দুই প্রহরের ভোগারতি ঘোষণা করিতেছে। তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতেছে ছাপাখানার হুম-হাম,—ধুপ-ধাপ্ আওয়াজ। কানে তালা লাগিয়া যায়। কিন্তু আমাদের কান তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়ীটা কাঁপিতেছে। ছাপাখানা, প্রকাশালয় আর পত্রিকার আপিস—এক সঙ্গে তিনটি; আমরাও তিনজন। নাম নাই বা করিলাম; ধরে নিন্, শ্যামবাবু, রামবাবু আর আমি! জ্যোতিষীর 'ডায়েরীর পাতায়' কাহার না নাম আছে! আপনার নামও খুঁজিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। এমনি মানুষের দুর্বলতা!

রামবাবু খাতাপত্র লিখিতেছেন; শ্যামবাবু আপিসের কর্তা। বেশির ভাগ সময় তিনি প্রুফ দেখেন। দূর হইতে মনে হয়, একজন উদাত্ত সুরে চণ্ডীপাঠ কিংবা অভিনয় করিতেছেন; অপরে তাহার ফাঁকে ফাঁকে সাধারণের অবোধ্য দুই-একটি কথা মাঝে মাঝে উচ্চারণ করিতেছেন; অর্থাৎ ছাপাখানার প্রুফ দেখা হইতেছে।

শ্যাম। গো

আমি। দাঁড়ি

শ্যাম। তোমার সঙ্গে গোটা

আমি। ফাঁক

শ্যাম। কতক কথা আছে

আমি। দাঁড়ি

শ্যাম। রো

আমি। দাঁড়ি

শ্যাম। কি

আমি। কোয়েরী

শ্যাম। গো

আমি। দাঁড়ি

শ্যাম। তুমি আমার কে

আমি। কোয়েরী

এমন সময় মেসিনম্যান ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবু, অর্ডার প্রুফটা!"

শ্যামবাবু আবৃত্তি-অভিনয় বন্ধ করিয়া হুকুম করিলেন, "আচ্ছা মশাই, আমি নিজেই এ প্রুফটা দেখছি; আপনি মেসিন-প্রুফটা দেখে দিন। কিন্তু সাবধান! ভাল করে দেখে দেবেন। জানেন ত রাজেনদা—!"

কোন উত্তর না দিয়া মেসিনপ্রুফ দেখিতে লাগিলাম; [ অর্থাৎ ছাপা হইবার আগে যথাযথ অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া ছাপিবার নির্দেশ দিতে হইবে। ] শ্যামবাবু আবার উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিয়া নিজেই প্রুফ দেখিতে লাগিলেন; এমন কি এইবার ছেদ-চিহ্নগুলিও বাদ পড়িল না। এমনি তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে!

শ্যাম। রো ( দাঁড়ি ) কেহ নহি ( কমা ) যত ( ফাঁক ) দিন পায়ে রাখেন ( কমা ) তত ( ফাঁক ) দিন দাসী ( কমা ) নইলে কেহ নই ( দাঁড়ি ) ( প্যারা ) গো ( দাঁড়ি ) পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম ( দাঁড়ি ) রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য ( কমা ) রাজার অধিক সম্পদ ( কমা ) অকলঙ্ক চরিত্র ( কমা ) অত্যাজ্য ধর্ম ( কমা ) সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি ( সেমি ) তুমি কি রোহিনি ( হ্রস্ব ইকার কমা )—

হঠাৎ বাধা পড়িল। এই বাড়ীর মেজমেয়ে স্বর্ণা আসিয়া বলিল, "মাষ্টারমশাই, মা আপনাকে উপরে ডেকেছেন!"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গা মোড়া দিয়া উপরে উঠিতে যাইব, ( বলিয়া রাখা ভাল যে, মাষ্টারমশাই বলিতে এ বাড়ীতে আমাকেই বুঝায় ), শ্যামবাবুর হাতে প্রুফটা দিতে উদ্যত হইতেই তিনি আবৃত্তি থামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়ান, আগে মেসিন-প্রুফটা শেষ করুন।" কিন্তু মেয়েটির পিছনে আর একটি কড়া রকমের দূত আসিয়া দাঁড়ায়, "না এক্ষুণি"।

শ্যামবাবু বিরক্ত হইয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন; মেসিন-প্রুফটা তাঁহার হাতে দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। তিনি আরও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যত সব ইয়ে,—কাজের সময় ডাকাডাকি। জ্যোতিষী হওয়ায় মশাই, আপনার বেশ সুবিধা হয়েছে; নিশ্চয়ই—" তাঁহার কথায় কান না দিয়া মেয়েটিকে অনুসরণ করিলাম; সে আমাকে উপরে লইয়া গিয়া একেবারে খাবার ঘরে হাজির করিল। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতভম্ব হইয়া গেলাম! বিশেষ কৌতূহলও হইল।

আমাদের এই বাড়ীর বৌদি অতিথি প্রবাসী বৌদিকে খাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছেন। দুই জনেই আসনের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; আসনের সামনে ভাতের থালা নানা ব্যঞ্জনে সজ্জিত। ঘড়িতে প্রায় দুইটা বাজে। প্রবাসী বৌদি কিছুতেই আজ অন্নগ্রহণ করিবেন না; তাঁহার মেয়ের নাকি বিবাহের কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল; পাত্রপক্ষও কথা দিয়াছিল। আজ সকালে নাকি তাঁহারা অমত করিয়া খবর দিয়াছেন! ইহাতে প্রবাসী বৌদির মনে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে।

ইঁহারা অর্থাৎ পাত্রীপক্ষ সুদূর প্রবাসে থাকেন। পাকাপাকি সব সুস্থির করার জন্য কর্তা-গিন্নী বহু আশা করিয়া আসিয়াছেন; ছেলেটি বেশ কৃতী; দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা প্রায় সব পাকাপাকি। এমন কি

প্রবাসী বৌদি ছেলের মায়ের সঙ্গে মধুর সম্পর্কও পাতাইয়া আসিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় আশাহতা হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন। কর্তা ত সদাশিব ভোলানাথ—বৈজ্ঞানিক; তাহার উপর সাহিত্যিক—কবি। তাঁহার আর কি,—যত দুশ্চিন্তা তাঁহার গৃহিণীর! সব বাড়ীর কর্তারা একই রকম; সংসারের চিন্তা তাহাদের একদম নাই!

আমার ডাক পড়িয়াছে,—প্রবাসী বৌদিকে সান্ত্বনা অর্থাৎ গ্যারাণ্টি দিতে হইবে; অর্থাৎ শুধু গণনা করিয়া এ বিবাহ হইবে কি না হইবে, তাহা বলা নয়; গণনার প্রভাবে বা দৈবীশক্তিতে তাহা ঘটাইয়া দিতে হইবে! শুধু মৌখিক সান্ত্বনায় চলিবে না, সকাল থেকে সে সব অনেক হইয়াছে; রথী, মহারথী, কর্তা এবং অকর্তা সকলেই হার মানিয়া গিয়াছেন। জল পর্যন্ত মুখে দেন নাই, এমন কি চা খাইতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাতে পর্যন্ত চুমুক দেন নাই। আমার ডাক পড়িয়াছে;—জ্যোতিষী কিনা তাই! জ্যোতিষীরা ত গ্যারাণ্টি দিয়া সর্বসিদ্ধি-কবচ দিয়া থাকেন; সম্ভবতঃ খবরের কাগজে কিংবা পঞ্জিকায় বৌদি বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমিও একবার সৌভাগ্য-কবচ ধারণ করিয়াছিলাম; লেখা ছিল 'কবচ ধারণে অনায়াসে চাকুরী লাভ!—' কিন্তু আয়াসের একশেষ করিয়া পায়ের জুতা পর্যন্ত ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; সৌভাগ্য এজীবনে দেখা দিবে কিনা সন্দেহ!

আমার কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। "এই বাড়ীর বড় মেয়ে গৌরীর বিবাহ ভাল জায়গায় হইয়া গিয়াছে; এই বাড়ীর ঐশ্বর্য, বাড়ীগাড়ী সবই জ্যোতিষীর কেরামতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে দিন দিন"—প্রবাসী বৌদির এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ক্ষোভে-দুঃখে অবশেষে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং এই

বাড়ীর আশ্রিত জ্যোতিষী যদি তাঁহার মেয়ের বিবাহ ঘটাইয়া দিতে পারেন—অর্থাৎ ঠিক এই নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গে, তাহা হইলে তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন ; নতুবা আজই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, কলিকাতায় অন্নজল আর গ্রহণ করিবেন না ; আর এই বাড়ীর সঙ্গে সমস্ত ঘনিষ্ঠতার এইখানেই শেষ হইবে!

হায়রে কপাল! আমার বিবাহের যোগ্য মেয়ের বিবাহ হইতেছে না! আমি লোকের সমৃদ্ধি বাড়াই! আর সেই আমি করি কিনা পঁচাত্তর টাকার জন্য দশটা-পাঁচটার এই আপিস!

মহা সমস্যায় পড়িলাম! কোন উপায়ই নাই ; নতুবা এই বাড়ীর মান থাকেনা। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া উভয়-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ছেদ পড়িবে! কথা দিতেই হইবে।

এই বাড়ীর বৌদি বলিলেন, 'দেখুন, আপনি দিদিকে কথা দিন ; তা হলেই সব চুকে যায়!'

আমি আমতা-আমতা করিতে লাগিলাম! বৌদি বলিলেন, "আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। আপনি মুখে 'হ্যাঁ' বললেই হয়ে যাবে।"

"আমি যেন বাক্‌সিদ্ধ বিধাতা পুরুষ! ইনি বলেন কি?" প্রকাশ্যে বলিলাম, "দেখুন বৌদি, এরূপ বিশ্বাস আপনাদের অন্যায়। জ্যোতিষী গণনায় হয়ত দু'একটা ঘটনা সত্য হয়ে গেছে। কিংবা এটা হবে কি না বলতে পারি। কিন্তু ঘটিয়ে দেবার মত দৈবীশক্তি আমি কোথা পাব?"

প্রবাসী বৌদি ক্ষোভমিশ্রিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন ; 'হাঁ, নিশ্চয় আছে! একবার মুখে বলুন—হ্যাঁ হবে।"

ইতিমধ্যে আমার পরমহিতৈষী এক ডাক্তার বন্ধু আমার নামের আগে "বাকসিদ্ধ"—এই উপাধি জুড়িয়া দিয়া একখানি বই উৎসর্গ

করিয়া বসিয়াছেন ; সুতরাং প্রবাসী-বৌদির উপর আর দোষারোপ করি কি করে !

বিধাতা-পুরুষকে স্মরণ করিয়া বলিতে হইল ঃ "হ্যাঁ হবে।"

প্রবাসী বৌদি এইবার আসনে বসিলেন ; মুখে গ্রাস তুলিবার আগে আমার দিকে তাকাইয়া যেন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সুরে বলিলেন, "দেখুন, এখনও বাকী আছে। বলুন, কাল সকালের মধ্যে সুখবর পাব।"

এই বাড়ীর বৌদির ইঙ্গিতে বলিতে হইল,—"নিশ্চয়ই পাবেন।"

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ;—পরদিন সকালেই সুখবর আসিয়াছিল। আমার খাতিরও বাড়িয়া গেল ; ইহাদের মহলে জ্যোতিষীর কেরামতির খবর রঞ্জিত ও অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইল।

প্রবাসীরা প্রফুল্ল মনে স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন পরে শুনিলাম, এই বিবাহের কথাবার্তায় নাকি ছেদ পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে একখানি চিঠি ও মোটা টাকার একটা মণিঅর্ডার আসিয়া উপস্থিত হইল।

চিঠি লিখিয়াছেন প্রবাসী বৌদি ; আর টাকা পাঠাইয়াছেন প্রবাসী দাদা। চিঠিতে বৌদি লিখিয়াছেন— * * * মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিশ্চিন্ত আছি ; আপনাকে অধিক আর কি লিখব ; আপনার উপর যেন চিরদিন আমাদের বিশ্বাস থাকে। এ সম্বন্ধে আপনার যা যা প্রয়োজন লিখলে খুশী হব। * * *

আর মণিঅর্ডারের কুপনে লেখা ছিল—"শুনে এসেছিলাম, তোমার স্ত্রীর অসুখ ; সময়ের অভাবে দেখা করে আসতে পারি নাই ; আবশ্যকমত ঔষধপত্রাদি কিনিও ; প্রয়োজন হ'লে আরো টাকার জন্য লিখিও।"

অবশ্য প্রয়োজন আর হয় নাই; তুইজনের প্রেরিত আশীর্বাদ মাথায় তুলিয়া লইলাম। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ভগবানকে বলিতে হইল—"মান বাঁচাও!"

মনে মনে ভাবি—আমার বাড়ীতে অসুখ হ'লে ওষুধ খাওয়াতে হয়; ডাক্তার ভট্টাচাযি কিংবা ডাক্তার গুপ্তকে ডাকিতে হয়! কিন্তু ডাক্তারের বাড়ীতে আমার দৈবীশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, রোগ সারাইবার জন্য! আর ডাক্তার-গৃহিণীর ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গাইতে আমার আশ্বাসই হয় ধন্বন্তরি!

প্রবাসী বৌদির মেয়ের বিবাহ অবশ্য নির্দিষ্ট জায়গায়ই হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবাহের আগেই সেই প্রুফ-দেখার কাজটা ছাড়িয়া দিয়াছি। কারণ এইরূপ অনুরোধ উপরোধে গ্যারান্টি দেওয়ার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার আর কোন দ্বিতীয় উপায় ছিলনা; বিশেষতঃ এই বাড়ীতে আর প্রবাসী বৌদির বাড়ীতে বিবাহ-যোগ্যা আরো চার-পাঁচটি মেয়ে রহিয়াছে! নিজের দৈবীশক্তির উপর তত নির্ভরও আর করিতে পারিলাম না। আর ওঁদের অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া নিরাশ হইয়াও পড়িয়াছিলাম।

# ছদ্মনামা সাহিত্যিক

একটি স্মরণীয় দিন !

সাধক-প্রকৃতির এক গুণীবন্ধু বেহালা বাজাইতেছেন ! বহু বন্ধুবান্ধবের সমাবেশ হইয়াছে ঃ আমরা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ ! ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার পাশে বসিলেন ; তাঁহার হাতে একটি ফুলের তোড়া ! উপস্থিত কাহারও সঙ্গে যে আগন্তুকের পরিচয় আছে, তাহা মনে হইল না। বেহালা-বাজানো শেষ হইলে সকলেই গল্পগুজবে মত্ত হইলেন ঃ অথচ এই ভদ্রলোক চুপ করিয়াই আছেন।

সমাগত বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সাহিত্যিক ; আমাকে কেন্দ্র করিয়াও কেহ কেহ রসিকতা করিতেছিলেন ; অর্থাৎ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আজগুবি গল্প হইতেছিল। স্বর্গত শ্রদ্ধেয় মোহিতবাবু নাকি একবার হাওড়ার এক অজ পাড়াগাঁয়ে এক তান্ত্রিক জ্যোতিষীর সন্ধানে গিয়াছিলেন ঃ সেই জ্যোতিষী নাকি মোহিতবাবুর সহযাত্রী একজন গ্রাজুয়েটকে বিদ্যাসম্বন্ধে প্রশ্ন করায় 'ম্যাট্রিক পাশও করতে পারবেন না' বলিয়াছিলেন।

আর একজন আগ্রায় বেকায়দায় পড়িয়া জ্যোতিষী সাজিয়া কিরূপে কলিকাতা পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় আসিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই কৌতুককর কাহিনী বলিতে লাগিলেন। অপর একজন কোন জ্যোতিষীর গুপ্তগণনার খাতায় ভারতের তথা জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী দৈবক্রমে দেখিয়াছিলেন, তাহারই চমকপ্রদ বর্ণনা করিলেন। একপাশে আমাদের এক সুদর্শন দাদা একজন মহিলার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে বিভোর ছিলেন।

হঠাৎ সেই আগন্তুক নিতান্ত মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, 'দেখুন,

আমি নিরিবিলিতে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কখন আপনার সময় হবে?'

আমি বলিলাম, 'যে কোন দিন সকালে আমার বাড়ীতে আসতে পারেন। কিন্তু আপনার পরিচয় পেলুম না!'

আগন্তুক বলিলেন, 'পরিচয় দিলেও আপনি চিনতে পারবেন না; অথচ সকলেই আমাকে চিনেন, পরিচয়টা নাই বা দিলাম।'

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া একটু সঙ্কুচিত হইলাম; আমি চিনি না, এইরূপ কোন গুণী ব্যক্তি হইবেন! সসম্ভ্রমে বলিলাম, "থাক, দরকার নেই: যে কোনদিন সকালের দিকে আসবেন।"

তিনি বলিলেন, 'হু' একদিনের ভেতরই আপনার সঙ্গে দেখা করব! কিন্তু আমার একটু নিরিবিলি প্রয়োজন; আমার কিছু গোপন কথা আছে!'

তারপর সেই আগন্তুক হাতের ফুলের তোড়াটি শুঁকিতে শুঁকিতে চলিয়া গেলেন। আমার কাছেই স্থু-বাবু বসিযাছিলেন, তাঁহাকে আগন্তুকের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'কই কোনদিন দেখিনি ত? আরও দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারাও একই কথা বলিলেন! গল্পগুজবে, চা-জলপানে আসর ভাঙ্গিয়া গেল!

তারপর একদিন সকাল বেলা সত্যই সেই অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঘরে প্রবেশ করিয়াই সহাস্যে আমাকে নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে; রোগা, মাথায় চুল খুবই কম; ফরসা বলা চলে। গায়ে একটি গরম পাঞ্জাবি; আজ হাতে একগোছা ডালিয়া ছিল।

আমিও তাঁহাকে প্রতি-নমস্কার করিলাম। তিনি বলিলেন,

'ভালই হয়েছে; ঘরে কেউ নেই। আমার কোষ্ঠীটা আপনাকে দেখাতে চাই।'

তিনি পকেট হইতে একখানি ঠিকুজী বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি বলিলাম, 'দেখুন, সেদিন আপনার পরিচয় নেওয়া হয় নি; আপনাকে আর কখনও দেখেছি বলে ত মনে হয় না!'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আমাকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন; তবে মনে রাখবার কথা নয়। আমার লেখাও নিশ্চয়ই পড়েছেন; কিন্তু আমাকে চিনবার কথা নয়। আমাকে কেউ চিনে না, অথচ সবাই আমাকে জানে।'

আমি সলজ্জভাবে বলিলাম ঃ ওঃ, আপনি একজন লেখক?—একজন সাহিত্যিক! কি দুর্ভাগ্য আমার! আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।'

তিনি উত্তর দিলেন, 'দুর্ভাগ্য আপনার নয়! আমার নিজেরই পায়ে আমি নিজে কুড়োল মেরেছি; আমার নিজেরই দুর্ভাগ্য! তাই জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়েছি!'

ভাবিলাম, হয়ত ভদ্রলোক স্বনামে কিংবা বেনামীতে লিখেন; কিন্তু সাহিত্যিক সমাজে বিশেষ পরিচিত নহেন; সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই নিজে যে লেখক এই পরিচয় দেন না। আমি বলিলাম, 'সে কি কথা! সম্ভবতঃ আপনার লেখা পড়ে থাকব; কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই; আপনার নামও জানি না; আজই তার অবসান হবে।'

"আমার নামও জানেন, কিন্তু আমাকে চিনেন না বলুন"—আগন্তুক হাসিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, "তা হতে পারে; অনেকেই কাগজে লেখেন, আবার বইও লেখেন; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কজনকেই বা চিনি।"

আগন্তুক যেন বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "তা চিনবেন কেমন করে? আমি ত আর কাগজের সম্পাদক নই কিংবা সভাপতিত্ব করে ঘুরে বেড়াই না! ঘটা করে জন্মদিনে রাজভেটও আদায় করি না।"

"যাক্, আপনার ঠিকুজীতে নাম দেখছি—শ্রীহরদয়াল চক্রবর্ত্তী। কিন্তু এ নামের কারো লেখা পড়েছি বলেত মনে হয় না।"—আমি সঙ্কোচের সঙ্গে নিবেদন করিলাম।

ভদ্রলোক এবার উচ্চহাস্যে বলিলেন, "এটা ত মশাই, কোষ্ঠীর নাম। আমার আসল নাম দিয়েও আমি লিখি না; ছদ্মনামেই লিখি।"

আমি তখন বলিলাম, "তা হলে ত কথাই নেই। যাক্ আপনি সাহিত্যিক: নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই আমার শ্রদ্ধা-ভাজন বন্ধু ও বিশেষ পরিচিত; আজ আপনার সঙ্গেও পরিচয়ের সৌভাগ্য হ'ল।"

তিনি বলিলেন, "আমার অনেক দিন থেকেই আপনার কাছে আসবার ইচ্ছে, কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠেনি; তারপর হয়ত আমার কথা বিশ্বাসই করবেন না, এই মনে করে আসিনি।"

আমি উত্তর দিলাম: 'এতে অবিশ্বাসের কথাই আসে না; আপনার কোষ্ঠী দেখাবেন, তার সঙ্গে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না: যাক্ আপনার দেখছি, মিথুনলগ্ন বৃষরাশি: শনি চন্দ্র একত্র আছে; আবার লগ্নে রাহু ও বুধ রয়েছে।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এখন আমার সময়টা কেমন? শত্রুদ্বারা কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে কি? আমার অনেক শত্রু মশাই, কেউ কেউ আবার শাসিয়েছে, রাস্তায় গুণ্ডা লাগিয়ে দেবে।"

আমি বলিলাম, "কই আপনার কোষ্ঠীতে ত এরকম কিছু পাওয়া

যাচ্ছে না; চন্দ্রটা শনিদ্বারা পীড়িত, অযথা দুশ্চিন্তা ভোগের লক্ষণ আছে।”

ভদ্রলোক বলিলেন, “ওসব আমি গ্রাহ্য করি না; কিন্তু মশাই ওরা আমায় মেরেই ত বড়লোক,—গাড়ী-বাড়ী করেছে: ফুলের মালা পাচ্ছে; সামান্য অসুখ-বিসুখ হলেই কাগজে হৈ হৈ করে খবর বেরিয়ে যায়।”

আমি বলিলাম, “যাক্ সময়টা অবশ্য খারাপ, শনি ও রাহু গোচরে অশুভ; তবু রাহুর দশা চলছে; এমন কোন ভয় দেখি না।”

তিনি যেন আমার কথায় কান দিলেন না; আপন মনেই বলিতে লাগিলেন. ‘সময়টা আমার কুড়ি বছর ধরেই খারাপ চলছে: এরই মধ্যে আমার চার-পাঁচখানা বই সিনেমায় দেখানো হয়ে গেছে; বইও বেরিয়েছে অনেক; আমার বই রবীন্দ্র-পুরস্কার, শরৎচন্দ্র-মেডেল ইত্যাদি পেয়েছে; অথচ আমি নিজে কিছুই পাইনি। এর মত দুঃখ কি আর আছে?”

যাঁহারা উক্ত পুরস্কারগুলি পেয়েছেন, তাঁহারা সকলেই আমার পরিচিত; কিন্তু ভদ্রলোক বলেন কি? আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন, “বুঝতে পারছেন না; না বুঝারই কথা। আমি ছদ্মনামে লিখি, একথা আগেই বলেছি; তা আবার আমার ছদ্মনাম একটি নয়,—অনেকগুলি। আপনাদের ওই সব নামজাদা লেখকেরা আমার ছদ্মনামের সুযোগ নিয়েছে। ওঁরা ত নিজের ঢাক নিজেই পেটায়। ধরুন, ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ বলে কেউ পুরস্কৃত হ’লে লোকে সেই আসল বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝবে। তারাশঙ্করের বই বলে বিজ্ঞাপিত হ’লে লোকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বুঝবে!

আমার এ জায়গায়ই হয়েছে ফ্যাসাদ। আমি যে ঐ সব নামেই লিখি।"

বুঝিলাম, ভদ্রলোকের মাথায় ছিট্ আছে; সাহিত্যিক হইবার বাতিকগ্রস্ত ভদ্রলোকের মাথার ঠিক নাই; সম্ভবতঃ পাগল হইয়া গিয়াছেন। চুপ করিয়া তাঁহার কথা শুনা ছাড়া আর উপায় নাই; তখন বলিলাম, "আমার যা বলবার বলে দিয়েছি; আপনার কোন ভয় নেই।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "মুখে ত বললেন ভয় নেই; কিন্তু মশাই আমি বাঁচি কি করে? আমাকে ওঁরা ফলো করেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার অপরাধ কি?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "অপরাধ আবার কি? আমার ছায়া নিয়েই ওঁরা লেখেন; আমি পত্রিকায় গল্প পাঠালাম, কিন্তু নাম হয়ে গেল ওঁদের। ওই 'ভুলি নাই', 'চাঁপাডাঙ্গার বউ' কিংবা 'শাপমুক্তি' সবই ত আমারই পরিকল্পনা।"

মনে মনে বেশ উত্যক্ত হইলাম। এইরূপ পাগলের পাল্লায় অযথা সময় নষ্ট হইতেছে, বিদায় হইলেই বাঁচি। আমি সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা, আমি আপনার আর কি উপকার করতে পারি!"

এইবার হাসিমুখে বলিলেন, "আমার কোষ্ঠীতে আর কিছু দেখেন কি না? অন্ততঃ রবীন্দ্র-পুরস্কারটা এবার যাতে ফসকে না যায়! সেখানে সব বুড়ো বুড়ো পণ্ডিত বিচারক; তাঁরা কি আমার মর্ম বুঝবে! যাতে আমার জীবনের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটা দূর হয়ে যায়, তার জন্য কোন গ্রহরত্ন কিংবা কবচ-মাদুলি—।"

আমি আপদ বিদায় করিবার মানসেই বলিলাম, "সব সময় প্রতিকারে কাজ হয় না; ঠিক ঠিক ঔষধ পড়লেও যেমন রোগ

কোন কোন ক্ষেত্রে দূর হয় না, কবচ-মাতুলির বেলাও একথা খাটে। তবে আপনি বৈদুর্য ও গোমেদ ধারণ করতে পারেন।”

তিনি বলিলেন, “কেন রাহু-কবচ ধারণ করলে হয় না? আমাদের পাড়ার তান্ত্রিক মুখুজ্যে রাহু-কবচ দিতে চেয়েছে : আর বগলামুখীর পূজার জন্য দেড়হাজার টাকা চেয়েছে।”

আমি বলিলাম, “তাই করতে পারেন। আমি ওসব তন্ত্রমন্ত্রের কিছুই জানি নে।”

তিনি বলিলেন, “বুঝেছি মশাই, লোক চিনতে আমার বাকী নেই, আপনি ওই সব সাহিত্যিকদের দলে কি না, তাই আমার যাতে উপকার হয় তা করবেন কেন? আচ্ছা, বলুন দেখি, আমার বিবাহের যোগ পড়েছে কি না?

আমি বলিলাম, “এই রাহুব দশায় শুক্রের অন্তরে এবার হতে পারে।”

তিনি উত্তর দিলেন, “কবে হয়ে যেত মশাই, ওই রাহু শালাই আমায় খেয়েছে; আমি আপনাদের গতানুগতিক পন্থায় বিয়ে করব না; একটু পূর্বপরিচিতি কিংবা উভয়ের মনের আদান-প্রদান দরকার। মেয়েরা অনেকেই আমাকে ভালবাসে; কিন্তু কোনটি যে আমাকে সত্যিকারের ভালবাসে, তা ওই রাহু আজও বুঝতে দিলে না; কাজেই বিয়ে করতে পারছি না।”

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম, “রাহু হচ্ছে দৈত্য, আর শুক্র দৈত্য-গুরু; এবার বোধ হয় বাধা পড়বে না।”

ভদ্রলোক এইবার বলিলেন, “হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে; একজন মহিলা আমার প্রতি একটু ঝুঁকেছেন বলে বুঝতে পারছি; কিন্তু বিশ্বাস নেই মশাই! তাইত প্রতিকার চাই; সেজন্যই আপনার কাছে আসা।”

ভদ্রলোকের কথা আর শেষ হয় না; তাঁহার কোষ্ঠী ফেরত দিলাম; কিন্তু তিনি বসিয়াই রহিলেন; আমি আমার একখানি খাতা হাতে লইয়া লেখার উদ্যোগ করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, 'মাপ করবেন। তন্ত্রমন্ত্র সত্যিই আমি জানি না; তাতে ফল হয় কি না তাও আমি জানি না; আপনি গোমেদ ও বৈদুর্য ধারণ করতে পারেন।"

"আপনি ত মশাই বলেই খালাস: এতগুলি টাকা দেয় কে? বলেছি ত আমার লেখাগুলি অপরে মেরে দিচ্ছে, আমার নামে কাগজে আমারই লেখা বের হয়, কিন্তু টাকা যায় অপরের ঠিকানায় অপরের নামে। আমার ছদ্মনামই আমার সর্বনাশ করেছে।" ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন!

আমি বলিলাম, 'আর ছদ্মনামে লিখবেন না; নিজের আসল নামেই লিখুন।'

তিনি বলিলেন, 'আপনি আমার চেয়েও বোকা! যে নাম চালু হয়ে গেছে, তা এতদিন পরে বদল করলে লোকে আমায় চিনবে কেন? আর নূতন লেখক ভেবে আমার লেখাও কেউ পড়বে না। মাঝখান থেকে আমার ছদ্মনামের সুনামটাও যাবে!"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বুঝিলাম এইবার তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইব। আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি যাইবার সময় নমস্কার জানাইয়া বলিলেন, আচ্ছা বলুন ত চন্দ্র দ্বাদশে শনির দ্বারা পীড়িত হলে এবং সেই সঙ্গে লগ্নপতি বুধও পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হলে কি হয়,—বুদ্ধি ঠিক থাকে? না—পাগল হয়!

## অধ্যাপকের বিড়ম্বনা

অধ্যাপক গুপ্তের কথাই ভাবিতেছিলাম।

এইমাত্র অধ্যাপক গুপ্তের বাড়ী হইতে ফিরিয়াছি: তাঁহার স্ত্রী পাগল হইয়া গিয়াছেন! আর অধ্যাপক গুপ্ত? তিনি যে কি হইয়াছেন তাহাই ভাবিতেছিলাম।

সেই সৌম্য সুদর্শন গৌরকান্তি যুবক; কি সুন্দর তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ! সুকণ্ঠ অধ্যাপক তিনি। অনর্গল শেলি, কীটস্, বায়রণ ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কবির মত হাবভাব ও কথাবার্তা; তাঁহার রূঢ় ভৎর্সনায়ও কবিকণ্ঠের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইত। নিত্য নূতন পোশাক: একসঙ্গে তিন চারিটি ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া টেবিলে রাখিতেন; তাঁহার ক্লাশে টুঁ-শব্দটি করিতেও কেহ সাহসী হইত না।

ডিসিপ্লিন ও এটিকেট্ সম্বন্ধে তাঁহার কড়া নজর ছিল। এমন কি খালি গায়ে তাঁহার বাড়ীর চাকরকে দেখিলেও তিনি চটিয়া যাইতেন। ঘটনাচক্রে একদিন অধ্যাপক গুপ্তের ছোট মেয়ে আছাড় খাইয়া গুরুতর ভাবে আহত হয়; তিনি তখন ক্লাশে বক্তৃতা করিতেছেন: বাড়ীর চাকর হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া খবর দিতে যায়; তাহাকে খালি গায়ে দেখিয়া তাহার বক্তব্য না শুনিয়াই বলিলেন, 'Get out! get out—এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, আদব কায়দা জান না; Nonsense!"

চাকরটি বলিল,' আজ্ঞে খুকী আছাড় খেয়ে……' তাহার কথা শুনিতে পাইলেন কিনা জানি না; অধ্যাপক গুপ্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'বেরিয়ে যাও শীগ্‌গির, আগে জামা গায়ে দিয়ে এসো।' বেচারী ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া গেল! মিনিট কয়েক পরে অন্য একজন অধ্যাপক

অধ্যাপক গুপ্তকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। শুনিলাম মেয়েটার অবস্থা বিশেষ গুরুতর!

এই সেই অধ্যাপক গুপ্ত! তাঁহার লেক্‌চার শুনিতে আমাদের ভাল লাগিলেও তাঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। তিনি হ্যাট, কোট, স্যুট পরিয়াই থাকিতেন। কদাচিৎ তাঁহাকে ধুতি চাদর পরিতে দেখিয়াছি; পুরাদস্তুর সাহেব ছিলেন তিনি! ইংরেজী কাব্য ও দর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

ত্রিশবৎসর পরে সেই অধ্যাপক গুপ্তকে দেখিলাম! যৌবনের জলুস চলিয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার সৌম্য সুদর্শন চেহারার পরিবর্তন হয় নাই! চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে: কিন্তু একি? খালি গায়ে ঈজি-চেয়ারের উপর হরিণের চামড়া বিছাইয়া তিনি বসিয়াছেন: গলায় তুলসীর মালার মত বড় বড় মালা! হাতে একখানি গীতা!

পাশেই টেবিলের উপর স্তূপাকারে বই সাজানো! দুই-একখানির নামও পড়া গেল: শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, তন্ত্রসার···। আমি যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইলাম! অধ্যাপক গুপ্ত আমাকে সেই পুরাতন স্নেহার্দ্রকণ্ঠে আহ্বান করিলেন: নাম ভুলেন নাই।

ত্রিশবৎসর আগেকার কথা মনে পড়িল। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হইল না; অধ্যাপক গুপ্তের এ কি পরিবর্তন! অবশ্য এখন তাঁহার বয়স ষাটের অনেক উপরে! কিন্তু তাই বলিয়া গীতা, ভাগবত কিংবা চরিতামৃত তিনি পড়িবেন! তিনি যে বৈষ্ণব ধর্মকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। বৈষ্ণব ধর্ম কেন, ভারতীয় কোন ধর্মের উপর তাঁহার আস্থা বিশেষ ছিল বলিয়া জানিতাম না! কবি মানুষ তিনি, কাব্য-পর্য্যায়ে উন্নীত ভারতীয় কবিদের অনেক কাব্য-কবিতাই তিনি জানিতেন; কিন্তু

তুলসীর মালা পরিয়া গায়ে কপালে হরিচন্দন মাখিবেন—ইহা কল্পনার অতীত ছিল! তাঁহার পরণে ছিল গরদের ধুতি।

আমাকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বস বাবা, কয়দিন ধরেই তোমার কথা ভাবছি। প্রফেসার ভট্টাচার্য সেদিন তোমার নাম করছিলেন। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তুমি বেশ কৃতী হয়েছ! সর্বত্রই তোমার বেশ সুনাম! এসব জ্যোতিষের ব্যাপার আবার কখন শিখলে?'

আমি যথাবিধি নমস্কার করিয়া তাঁহার পাশে একখানি চেয়ারে বসিলাম; লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, "ধরাবাঁধা ভাবে কিছুই পড়িনি; কিন্তু এদিকে আমার একটা কৌতূহল বরাবরই ছিল; কিছু কিছু চর্চাও করেছি। ইদানীং এবিষয়ে লিখতেও আরম্ভ করেছি।"

অধ্যাপক গুপ্ত মধুর কণ্ঠে হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'না বাবা, কিছু কিছু চর্চায় এরকম লেখা যায় না। তোমার লেখা আমি পড়েছি! বেশ আনন্দ হ'ল! আমাদেরই একজন ছাত্র বাংলাদেশে এত সুনাম করেছে!

আমি লজ্জিত হইলাম। অধ্যাপক গুপ্ত বরাবরই ছাত্র-গৌরবে গর্ববোধ করিতেন; কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের গ্রাহ্যই করিতেন না। পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় চাকুরী করিতেন. তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অধিকতর আনন্দিত হইতেন; অভ্যর্থনাও করিতেন ভালভাবে। কিন্তু সাধারণ কেরাণী, কিংবা স্কুলমাষ্টার হইলে অনেক সময় সাক্ষাৎ হইলেও চিনিতেন না! আমার মত ছাত্রের কথা তাঁহার মনে না থাকারই কথা এবং তাঁহার নিকট আদৃত না হওয়াই স্বাভাবিক! বুঝিলাম, অধ্যাপক গুপ্তের সত্যই একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে!

আজ আমার এখানে আকস্মিক আবির্ভাবেরও কারণ আছে! অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাহা ঘটাইয়াছেন! আমার বর্তমান জ্যোতিষ-

চর্চাই এই অঘটন ঘটানোর অন্যতম কারণ! মনে পড়িল, অনেক কষ্টে বি. এ. পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় এম. এ. পড়িতাম, তখন ঘটনাচক্রে একদিন অধ্যাপক গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম: তখন মাত্র মাসকয়েক তাঁহার কলেজ ছাড়িয়াছি: তথাপি তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই; নামধাম এবং কয়েকমাস আগে যে আমি তাঁহারই ছাত্র ছিলাম সেকথা বলিলাম: তখন কতকটা চিনিতে পারিলেন; বিশেষতঃ যখন বলিলাম, আমি কলিকাতায় এম. এ. পড়ি, তখন তাঁহার মুখে একটুখানি সহানুভূতির হাসি ফুটিয়াছিল।

এই সেই অধ্যাপক গুপ্ত! আমি যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি। অধ্যাপক গুপ্তের এত পরিবর্তন? বার্ধক্যে অনেকেরই এইরূপ ধর্মের দিকে ঝোঁক আসে; কিন্তু তাহা যে এতখানি হইবে, ভাবিতে পারি নাই। অধ্যাপক ভট্টাচার্য আমাকে কয়েকবারই অধ্যাপক গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন! অধ্যাপক গুপ্তের স্ত্রী নাকি পাগল হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার সংসারে নানা অশান্তি; সেইহেতু জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার সমাধান করিতে চান!

অধ্যাপক গুপ্ত বলিলেন, "এসেছ বাবা, বেশ করেছ! আজ আমার জন্মদিনে তোমার মত প্রিয়জনকে দেখতে পেলাম, এটা একটা পরম শুভ ইঙ্গিত! সংসারের দিকে আর আমার মন নেই; এখন বই নিয়েই দিন কাটাই। সারাজীবনটা চাকুরীর খাতিরে ঝুটো সাহিত্য ও কাব্য চর্চা করেছি। কিন্তু (গীতাখানি তুলিয়া ধরিয়া) এর মত পরম জ্ঞান তোমার সেক্‌সপীয়র, শেলি, কীটস্‌ কিংবা রবীন্দ্রনাথেও নেই।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম; বলিলাম, "অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল: আমার একটি

মেয়ের অসুখের জন্য বড় বিব্রত আছি ঃ তাই সময় করে উঠতে পারি না।”

অধ্যাপক গুপ্ত বলিলেন, “হ্যাঁ, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মুখেই শুনেছি ঃ সে ভাল হয়ে যাবে বাবা! আমি আমার এই জন্মদিনে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি; যাক তোমার সঙ্গে আমার একটু জরুরী দরকার আছে ঃ আমি ত এসব বিশ্বাসই করি না। তবুও সংসারে যখন রয়েছি, ওদের চিন্তা একটু করতে হয় বৈ কি! এই ধর না, বড় ছেলেটা বেকার বসে রয়েছে! তার উপর অমন সুন্দর জামাই আমার হঠাৎ মারা গিয়েছে! তোমাদের মা অর্থাৎ আমার স্ত্রীর মাথার দোষ হয়েছে! এসব আর সহ্য করতে পারছি নে।”

অধ্যাপক গুপ্ত ড্রয়ার হইতে কয়েকখানি বাঁধানো ছোট ছোট খাতা বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। প্রথমেই তাঁহার কোষ্ঠী দেখিলাম ঃ বলিলাম, “এখন ত আপনার বিশেষ কিছু খারাপ দেখি না।”

অধ্যাপক গুপ্ত সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আমার আর ভালমন্দ কি হবে বাবা? এই দেখ, (ডানবাহু তুলিয়া একটা চতুষ্কোণ স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত কবচ দেখাইলেন) সিদ্ধ-কবচ! আমার গুরুর নাম শুনেছো……স্বামী। তিনি দিয়েছেন! এ কবচ দেহে থাকলে সুখ-দুঃখ, পাপ-তাপ, পিশাচ-গন্ধর্ব কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আর আমি, আমার ত কিছুই নেই বাবা! সবই তাঁর চরণে সমর্পণ করেছি! যাক, ওই অপোগণ্ড ছেলেটার কোষ্ঠী দেখ।’

অধ্যাপক-পুত্রের কোষ্ঠী দেখিলাম ঃ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলাম, “কোনরূপ যন্ত্রপাঁতির ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিন। তাতে ভাল হবে। এরূপ যোগই রয়েছে!”

অধ্যাপক মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন ঃ ‘হ্যাঁ বাবা, আমি তাই স্থির করেছি। ছেলের শ্বশুর ওই সব কারবার করে লাল হয়ে উঠেছেন ঃ

তিনিই বলছিলেন! কিন্তু হতভাগাটা কেবল -ইজম্ করে বেড়াচ্ছে। বাবা আর শ্বশুরের পয়সায় -ইজম্ করা কি না! যাক্ তোমার মায়ের (অর্থাৎ অধ্যাপক পত্নীর) কথাটা আগে শোন ঃ বছর দুই আগে হঠাৎ তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। ঘরে বন্ধ করে রাখতে হত; কত চিকিৎসা করা হয়েছে; কিছুতেই কিছু হয় নি! সেই অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে! তিনি স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছেন! (অধ্যাপক গুপ্ত অজানার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন) যে সব কথা তিনি বলেন, সেগুলি পরম তত্ত্ব! আমি ত বিস্মিত হয়ে গেছি! এত গ্রন্থ ঘেঁটেও আমি যা জানলাম না, তিনি অজানার কৃপায় তার অধিকারী হয়েছেন! তুমি তাঁকে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

সেই ঘরে তখন কেহই ছিল না; অধ্যাপক গুপ্ত মধুরকণ্ঠে ডাকিলেন, 'সতী, সতী, বৌমা।' "বাবা, আমায় ডাকছেন"—বলিয়া একটি তরুণী বধূ ঘরে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপক গুপ্ত আমার সঙ্গে তাঁহার পুত্রবধূর পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে ডাক।' তরুণীটি বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই অধ্যাপক-গৃহিণী, বধূমাতা ও অধ্যাপকপুত্র প্রবেশ করিলেন।

অধ্যাপক-গৃহিণী বৃদ্ধা; পরণে মটকার লালপাড় শাড়ী; নিরাভরণা বলা চলে না; হাতে শাঁখা এবং গলায় তুলসীর মালা; হাতে বলয়ের মত রুদ্রাক্ষমালা। তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনি আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার কথা জানি বাবা, তুমি তিন জন্ম আগে আমারই ছেলে ছিলে! সেই মনে নেই, বিষ্টিতে ভিজে আম কুড়িয়ে আনতে গেলে! তোমার জ্বর হল! তারপর সাতদিনের জ্বরে তোমাকে হারালুম! তারপর তোমাকে কত খুঁজেছি! ওই সেদিন রামকৃষ্ণঠাকুর এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যীশুও! তাঁদেরও তোমার কথা বলেছি; তাই বুঝি তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন! জান বাবা, এ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে

আমি রয়েছি : তোমরা সবাই আমার বুকে রয়েছ : তবু মনে হয়, তোমাদের খুঁজে পাচ্ছি না !.. ”

অধ্যাপক-গৃহিণী অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, আমরা শ্রোতা ! অধ্যাপক গুপ্ত তৃপ্তির সহিত আমার দিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিতেছিলেন। অধ্যাপক পুত্রের যেন কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না। বধূমাতা হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, 'মা, এসব কথা পরে হবে 'খন। ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে এসেছেন ; জলখাবার টাবার আগে দি।'

শাশুড়ী বধূর কথায় একটু সঙ্কুচিত হইলেন, "তাইত ছেলে আমার এখনও কিছু মুখে দেয় নি !" তিনি বাইরে যাইবার উপক্রম করিলে বধূমাতা বলিলেন, "ঠাকুরকে বলে এসেছি, এখনই সব নিয়ে আসছে।"

শাশুড়ীর বক্তৃতা আবার আরম্ভ হইল ; "দেখত বাবা, ওই গাদা গাদা বই পড়ে কি ঠাকুরকে পাওয়া যায় ? পুড়িয়ে ফেল ওসব বই ! আগুন ধরিয়ে দাও ! গুরুর নাম জপ ! তবেই হ'ল। সারাটা জীবন বই পড়ে কাটালে, তবু ওঁর কোন আক্কেল হল না বাবা !"

বুঝিলাম অধ্যাপক-গৃহিণীকে সহজে ক্ষান্ত করা যাইবে না ; আবোল তাবোল বকিয়া আমার সময় নষ্ট করিবেন। কৌশলের আশ্রয় লইতে হইল, "সত্যিই মা, আপনাকে দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে ! আপনি শুধু আপনার ছেলেদেরই মা নন, আপনি সকলেরই মা ! আপনার হাতে, নিশ্চয়ই তার কোন আভাস আছে।" তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, দেখিলাম শিরোরেখা বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ দেখার পর হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম ! তিনি চণ্ডীর পংক্তি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥

অকস্মাৎ আরও কি বলিতে বলিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বধূমাতাও চলিলেন। অধ্যাপক গুপ্ত বলিলেন, 'দেখেছো, আমি যা বলেছি, তা ঠিক কি না! আমার মনে হয়, ইনি জাতিস্মর! অথবা শাপভ্রষ্টা দেবী!'

অধ্যাপক-পুত্র বিরক্তির সুরে বলিল, 'দেবী হতে পারেন; কিন্তু বাড়ীতে কাউকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন কই? আপনারা দু'জনে ধর্মকর্ম করুন, তাতে আমাদের কিছুই বলবার নেই! কিন্তু রাতদিন বক্তৃতা, গান, চীৎকার—এগুলি কত সহ্য করা যায়! আমরা চাই মায়ের ভাল চিকিৎসা করাতে, কিন্তু আপনিই তাতে বাধা দিচ্ছেন।'

আমি বলিলাম, 'দেখ ভাই, তুমি ঠিক কথাই বলেছ; আমার মনে হয়, ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিতে মায়ের মাথা গোলমাল হয়ে গেছে, আর তিনি জাতিস্মর হলেও ভাবোন্মাদ অবস্থায় পূর্বজন্ম ও বর্তমান জন্ম জড়িয়ে ফেলে গোলমাল করে বসেন। সত্যি তাঁর চিকিৎসার দরকার।'

অধ্যাপক গুপ্ত বলিলেন, 'এর কি কোন চিকিৎসা আছে? উনি ত সত্যিকারের পাগল নন। তিনি সত্যিই ভাবোন্মাদ!'

আমি বলিলাম, তবুও ভাবোন্মাদ অবস্থায় যদি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন! তাহলেই বিপদ।

অধ্যাপক-পুত্র বলিল, 'আর বলবেন না; ঐ 'যদা যদা দানবোত্থা' বলেই একদিন কাটারি নিয়ে আমাদের ঠাকুরকে কাটতে গিয়েছিলেন। সেই থেকে সতী রাতদিন মাকে চোখে চোখে রাখে। বাবা ত বলেই খালাস! এঘরে মা ঢুকলেই সতী, সতী করে হাঁক ছাড়েন!'

অধ্যাপক গুপ্তকে অনেকক্ষণ বুঝাইলাম: জ্যোতিষের প্রমাণ দিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে হইল: ভাবোন্মাদিনী অধ্যাপক-গৃহিণী দানব

বধ করিতে গিয়া কোন্ দিন সর্বনাশ করিয়া বসিবেন! অধ্যাপক গুপ্ত রাজী হইলেন; ছেলের উপর মায়ের চিকিৎসার-ব্যবস্থার ভার পড়িল। আমি নিষ্কৃতি পাইলাম!

অধ্যাপক গুপ্তের নিকট বিদায় লইলাম। অধ্যাপক-পুত্র আমার সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইল, বলিল, "বাবারও মাথা খারাপ হয়েছে; কি বলেন?"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। আরও একবার অধ্যাপক গুপ্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন: কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই।

# পূর্বজন্মের প্রিয়া

জ্যোতিষীর কারবার বর্তমান জগৎ লইয়া, কিন্তু পূর্বজন্ম আসিয়া যে বর্তমান জন্মকে আলোড়িত করিবে, স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই। পূর্বজন্মের কথা কেউ ভাবে না; পরজন্ম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে একটু চিন্তা হয় বটে; বিশেষতঃ ফুটপাতে যখন ছবিওয়ালাদের টাঙ্গানো ছবিতে মৃত্যুর পর যমালয়ের বিচারের চিত্র দেখি! কিন্তু পূর্বজন্মের ধারণা বর্তমান জন্মে আমাদের পারিবারিক জীবনে যে এমন ভাবে আঘাত করিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে—সে কথা সম্ভবতঃ কেহই চিন্তা করেন নাই।

আমার এক ভৃগু-গুরু আছেন: চলচ্চিত্র জগতের এক নামকরা পরিচালক বন্ধুর সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে গিয়া আমি তাঁহার বিশেষ সুনজরে পড়িয়া যাই। তিনি আধপাগলা গোছের; খেরোয় বাঁধা কয়েকখানি খাতার সাহায্যে যে কোন লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলিতে তিনি ওস্তাদ। লাল ও কাল কালিতে আঁকাবাঁকা রেখায় খাতাগুলি ভর্তি, তাহার ভাষা ও লিপি যে কোন্ দেশের তাহা বলা যায় না; তিনি বলেন, পাহাড়ী। ছোটবেলায় নাকি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন; নেপালের জঙ্গলে কাপালিক তান্ত্রিকের আশ্রমে ঘটনাচক্রে একাকী উপস্থিত হন; হাঁড়িকাঠে বলির জন্য উদ্যত কাপালিক-শিষ্য গুরুর ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাঁচায়। সেই বৃদ্ধ গুরুই তাঁহাকে দীক্ষিত করেন এবং গুরুর মৃত্যুর পর ভৃগু-সংহিতার মত মহারত্ন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পান। তাহার পর অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে; এসিয়া ও আফ্রিকার অগম্য জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিধাতার নির্দেশে আমাদের ভৃগু-গুরু দেশে ফিরিয়াছেন।

মাতৃভক্ত ভৃগু-গুরু বৃদ্ধ বয়সে মায়ের আদেশে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছেন এবং মানবের হিতার্থে ভৃগু-প্রচার করিতেছেন।

আমারই সম্মুখে একদিন সদ্য ফরাসী দেশ হইতে আগতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্টা এক নামকরা মহিলার সম্বন্ধে তাঁহার খেরোর খাতা খুলিয়া বলিলেন ঃ

"পূর্বজন্মে গোকুলে অর্থাৎ বৃন্দাবনে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে; তোমার প্রেমে পড়িয়াছিল অষ্টাদশ বর্ষীয় এক যুবক; সে দিবাভাগে যমুনাতীরে কদম্ববৃক্ষে বসিয়া বাঁশী বাজাইত। তুমি গৃহে বসিয়া আকুল হইতে; যেহেতু যুবকটি তোমারই সমবয়স্ক এবং তোমার পিতার অধীনস্থ কোন ভূস্বামীর পুত্র, এইহেতু তোমার পিতা রাজা সুদর্শনদেব তাঁহার সহিত তোমার বিবাহে সম্মতি দান করেন নাই। যুবকটি তোমারই চিত্র আঁকিয়া নিশিযাপন করিত এবং প্রাতে তাহা তোমায় উপহার দিত। এই অবস্থায় তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার পিতা প্রতিবেশী রাজপুত্র ধুরন্ধর নামে এক বিংশবর্ষীয় যুবকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেন, সেই ধুরন্ধর তোমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিত। বর্তমান জন্মে সেই ধুরন্ধরই তোমার স্বামী হইয়াছে ঃ সেই বংশীবাদক এখনও তোমার আশায় অপেক্ষা করিতেছে ঃ বর্তমান জন্মে সে তোমার বাল্যবন্ধু ছিল……।

মহিলাটি বাংলা জানেন না; ভৃগু-গুরুও ইংরেজী জানেন না; আমাকেই দোভাষীর কাজ করিতে হইয়াছিল। মহিলাটি ভৃগু-গুরুর বাণী শুনিয়া মাঝে মাঝে বিস্ময় ও পুলক প্রকাশ করিতেছিলেন। পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে এই মহিলার বয়স; ঘটনাচক্রে তাঁহার বর্তমান জন্মের বাল্যবন্ধু বংশীবাদক ও চিত্রকর; উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক ছিল; এবং বিবাহের স্বপ্নও উভয়ে দেখিতেছিলেন, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা। মাতাপিতার হস্তক্ষেপে ধুরন্ধর-চরিত্রের অপর এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

ভৃগু-গুরুর আলৌকিক ত্রিকাল-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমি

নিজেই বিস্মিত হইলাম ; বিদেশী মহিলাটির' ত কথাই নাই। ভারতের অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার জয় হইল ; বর্তমান জন্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন ; বিশেষতঃ ধুরন্ধর স্বামীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া ও বাল্যবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তাঁহার বিশেষ জিজ্ঞাসা ছিল। মহিলাটির সঙ্গে একজন ফরাসী দেশীয় পর্যটকও ছিলেন ঃ উভয়ে মিলিয়া ভৃগু-গুরুর অনেকগুলি আলোক-চিত্র তুলিয়া লইলেন। আমিও মনে মনে গর্বিত হইলাম ঃ জ্যোতির্গুরু ভৃগু-পরাশর-বশিষ্ঠের উদ্দেশ্যে প্রণামও জানাইলাম।

সেই ভৃগু-গুরুও আমার মত সমস্যায় পড়েন নাই ; পূর্বজন্ম কিংবা পরজন্ম বেশ জোরালো ভাষায় গুছাইয়া বলিলেও বর্তমান জন্মের বিপদ আপদ কাটাইয়া সমৃদ্ধ হইবার জন্য তাঁহার সংহিতা কবচ-মাতুলি ধারণেরই উপদেশ দেয়।

মনে করিয়াছিলাম, কেহ হয়ত রসিকতা করিয়া চিঠি লিখিয়াছে ! কিন্তু পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় তাহা যে নির্মম সত্য এবং এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম ; চিঠিখানি এইরূপ ঃ

সবিনয় নিবেদন,

* * * আমার সঙ্গে কোন ভদ্রমহিলার ( বিবাহিত ) আজ প্রায় এক বৎসরের উপর আলাপ হইয়াছে। ভদ্রমহিলার রাশিচক্র দিলাম। জন্মসন ঠিক বুঝা যাইতেছে না ; যেহেতু কোষ্ঠীর স্থানে স্থানে পোকায় কাটিয়া দিয়াছে। যতদূর মনে হয়, ১৯২৬ সনের ২রা বৈশাখ শনিবার। * * * * আমার জন্ম তারিখ ও সময় বাং ১৩৩৫ সন, ৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার। * * * আমরা উভয়েই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং আমাদের উভয়ের বিশ্বাস আমরা উভয়ে গত জন্মে স্বামীস্ত্রীরূপে ছিলাম। কর্মের কোন ত্রুটির জন্য আমরা এই জন্মে

পৃথক অবস্থায় থাকিলেও মনের গতি এক; চিন্তাধারাও এক। পরবর্তী জন্মে আমরা উভয়েই মিলিত হইব,—এই দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জীবনে কি আমাদের মিলন হওয়ার সম্ভাবনা আছে? * *

নীরব ছিলাম; ভৃগু-গুরুর মত হয়ত একটা কাহিনী সৃষ্টি করিয়া ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করিতে পারিতাম; কিন্তু বর্তমান জীবনে তাঁহাদের উভয়ের মিলন যে অপরের পক্ষে কিরূপ মর্মান্তিক, তাহা চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম; সুতরাং নীরব হইলাম।

মাসখানেক পরে আবার ভদ্রলোক পত্রাঘাত করিলেন, "শয়নে-স্বপনে আমার এবং আমার প্রিয়ার একই চিন্তা—আমাদের মিলন কি সম্ভব নহে?"

অবশেষে যুবকটি উপস্থিত হইয়া উপদেশ চাহিলেন; তাঁহাকে সংসারের দিক্ হইতে ইহার অযৌক্তিকতা ও অশান্তিকর ফলাফলের কথা শুনাইলাম; দেখিলাম, তিনি ইহাতে খুশী হইলেন না। অবশেষে সেই আধপাগলা ভৃগু-গুরুর ঠিকানা দিলাম: আমিও জ্যোতিষীর দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলাম:—

জন্মান্তরীণ-প্রেম একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের গৃহসুখে ফাটল ধরাইয়াছে। দশবারো বৎসর ধরিয়া আসঙ্গ-মোহ, মান অভিমান, ঝগড়াঝাঁটি, অশ্রু-হাসি ও প্রীতি-মমতায় যে দাম্পত্য-সুখনীড় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পরলোকের বা পূর্বজন্মের ভূত উৎপাত করিতেছে। তাঁহার ত্রিংশৎবর্ষীয়া গৃহিণী পঞ্চবিংশবর্ষীয় পূর্বজন্মের দয়িতকে ফিরিয়া পাইয়াছেন; বর্তমান স্বামীর (যাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ) প্রতি সংকোচ আসিয়াছে। দশবারো বৎসর ধরিয়া মহিলাটি যেন অভিশপ্ত কারাজীবন যাপন করিয়াছেন; আজ নিজেই লজ্জায় ও সংকোচে মরিয়া যাইতেছেন: এ যেন পরপুরুষের গৃহে বাসের সামিল হইয়াছে!

কি লজ্জা! যদিও বর্তমান স্বামীর স্নেহভালবাসার অন্ত নাই। গয়না-গাটি কিংবা সাধ-আহ্লাদ পূরণে এই মধ্যবিত্ত গোবেচারী সাধ্যের অতিরিক্ত করেন; কিছুদিন আগেও দুই চারিদিন চিত্রগৃহে স্বামী-স্ত্রীকে পাশাপাশি বসিয়া ছবি দেখিতে দেখা গিয়াছে। অধুনা অনুজস্থানীয় বিশ্বাসী এই যুবকের এখানে যাতায়াত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশ-বারো বৎসরের দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হইয়াছে: পত্নী আনমনা ও দিন দিন শীর্ণা হইতেছেন। আর সে হাসিমুখ নাই। কাহার প্রতীক্ষায় যেন কানখাড়া করিয়া থাকেন! আপিস-ক্লান্ত স্বামী গৃহে ফিরিয়া দেখেন, পত্নী সিনেমায় গিয়াছেন অথবা গৃহে থাকিলেও বিছানায় শুইয়া গম্ভীর মনোযোগে 'পরলোক-কা-বাত' পড়িতেছেন, অন্য খেয়ালই তাঁহার নাই।

# পূর্বজন্মের পতি

আধুনিক তরুণীদিগের রুচি ও প্রকৃতি একটু বিশিষ্ট ধরণের তাহাই জানি; কিন্তু তাহার বিপরীত কিছু দেখিলেই আশ্চর্য হইতে হয়ঃ যেখানে ধন-জন-পদ কিংবা বয়সের কোন মোহই নাই, সেইরূপ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আত্মনিবেদন এই প্রথম দেখিলামঃ

ষাট বৎসরের উপর বয়স, গৌরবর্ণ, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। চোখে কম দেখেন; ছানি পড়িতেছে। দরজার কাছে আসিয়া এদিক্-ওদিক্ হাতড়াইয়া স-সংকোচে ঘরে ঢুকিলেন। কথাও তাঁহার জড়ানো; একটু তোতলা বলিয়া মনে হইল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনিই পণ্ডিতমশাই! আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে; নিরিবিলিতে বলতে চাই।"

আমি বলিলাম, 'ঘরে আর কেউ নেই; আপনার কথা বলতে পারেন।'

"আমার কোষ্ঠীটা দেখাতে চাই।"—বলিয়া তিনি জীর্ণ একখানা ঠিকুজী বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন।

জন্মের তারিখ দেখিয়া বুঝিলাম, ভদ্রলোকের বয়স বাষট্টি বৎসর কয়েক মাস। তিনি বলিলেন, "আমার প্রধান জিজ্ঞাস্য বাকী জীবনটা কেমন যাবে? আমার বর্তমান স্ত্রীর শরীর বিশেষ ভাল নয়; তাঁর কোন ফাঁড়াটাড়া আছে কি?"

আমি বলিলাম, "চার পাঁচ বৎসর আপনার শনির দশা চলছে; দশাটা ভাল নয়।—"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তিন-চার বছরই হবে, কি বলব মশাই, ভাল চাকুরিই করতাম—সওদাগরী আপিসে; চোখের দোষেই গেল! ডাক্তার বলে কিনা ছানি পড়ছে!"

আমি বলিলাম, "এই বয়সে চাকরি না থাকলে যত কষ্টই হোক না কেন, চোখের দোষ ঘটলে বড়ই বিপদ্ হয়!"

তিনি উত্তর দিলেন, "যা বলেছেন ; ছেলেমেয়ে নেই, স্বামী-স্ত্রীতে বেশ চলে যাচ্ছে। ঘরে নারায়ণ আছেন; তাঁর সেবায় দিন কাটিয়ে দিই।"

আমি ভাবিলাম, ভদ্রলোকের চোখের চাইতে পত্নীহানির আশঙ্কাই তাঁহাকে অধিকতর বিচলিত করিতেছে। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আপনি বেশি চিন্তা করবেন না ; বাকী জীবনটা মোটামুটি ভালই যাবে ; শনির ক্ষেত্রে আপনার জন্ম ; সুতরাং শনি বিশেষ কষ্ট দেবে বলে মনে হয় না।"

তিনি উত্তর দিলেন, "সেটা আমারও অনুমান! কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীরটা খারাপ না হলেও মাথার কোনরূপ গোলযোগ ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে।"

'এরূপ কিছু ত দেখিনা ঃ তবে তিনি একটু বদরাগী হতে পারেন ; কারণ মঙ্গলের দৃষ্টি রয়েছে চন্দ্রের উপর। আচ্ছা, আপনি একটু আগে বলছিলেন, আপনার বর্তমান স্ত্রী ; এর আগে কি আপনার কোন স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে ?''—আমি সন্দেহাত্মক সুরে প্রশ্ন করিলাম।

একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, আগন্তুক বেশ জরাগ্রস্ত হইয়াছেন ; আসন হইতে দেড় গজ দূরে বসিয়া কথা বলিলেও কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে একপ্রকার বিশ্রী গন্ধ ছড়াইতেছিল।

তিনি এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন, "না মশাই, আমার একটি মাত্র বিবাহ ; আমরা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সন্তান ; বাইরে জল পর্যন্ত স্পর্শ করি না। তবুও এ ব্যাপারে একটা রহস্য রয়েছে।"

আমার কৌতূহল বাড়িল ; বলিলাম, "আপনি বলুন ; আমি শুনি। আপনার কোষ্ঠীতে এমন কিছু পাচ্ছি না।"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আর বিয়ে করিনি বটে ; কিন্তু আর একজন আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম হয়ত যৌবনের কোন প্রেম-প্রীতির পরিণামে কোন মহিলা অবিবাহিতা থাকিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এখন ত আর প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকার সময় নাই! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁর বয়স কত ?"

তিনি নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুরে বলিলেন, "তাঁর বযস নিতান্ত অল্প ; এই ধরুন না, এ বছর সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ পরীক্ষা দিয়েছে! আর শুধু প্রতীক্ষা নয় মশাই, সে আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে।"

ভাবিলাম, বৃদ্ধ বয়সের রীতি অনুযায়ী ভদ্রলোকের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। হয়ত নাতনি কিংবা শ্যালিকা সম্পর্কীয়া কেউ রসিকতা করে ; ইহাতেই ভদ্রলোক মশগুল হইয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম, "তারপর কি হয়েছে ? তাঁর মা-বাবা কি বলেন ? তাঁরা কি এসব কথা জানেন ?"

তিনি বলিলেন, "কতকটা জানেন বৈ কি ? কারণ, মেয়েটাকে কিছুতেই অন্যত্র বিবাহে রাজী করানো যাচ্ছেনা। ভাল ভাল সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন ; তারপর যখন আপনার স্ত্রী বেঁচে রয়েছেন!"

তিনি বলিলেন, "কত বুঝিয়েছি, তা কি শোনে! মনেপ্রাণে আমাকে আত্মসমর্পণ করেছে! অবশ্য স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করবার মত সুযোগ আমাদের হয় নি। তাঁকে নিয়ে বড় সংকটে পড়েছি!"

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, "সংকট অবশ্য হবারই কথা। কিন্তু মেয়েটির বাড়ী না গেলেই সংকট কেটে যাবে।"

তিনি উচ্চহাস্যে বলিলেন, "সে রকম মেয়েই নয়। আমার বাড়ীতে আসে, এটা-সেটা করে; এর জন্যই আমার স্ত্রী ক্ষেপে আগুন; তাঁর পাগলামি দেখা দিতে বাকী নেই।"

আমি বুঝিলাম, এ ব্যাপারে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর উপরও ভূত চাপিয়াছে। তাঁহাকে বলিলাম, "এতে আপনার সংসারে অশান্তিই বেড়ে চলবে। আচ্ছা এই তরুণীর এরূপ অভিরুচির কারণটা কি?"

বৃদ্ধ হাসি মুখে বলিলেন, "আমি মশাই, কিছুই বুঝিনা। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস পূর্বজন্মে তিনি আমার সহধর্মিণী ছিলেন; সুতরাং এই জন্মে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তখন বিবাহ-মিলনে বাধা থাকতে পারেনা। যেহেতু তিনি এখনও অবিবাহিতা।"

আমার কৌতূহল বাড়িল: "আচ্ছা, তিনি কি জাতিস্মর? পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতি কি তাঁর মনে আছে!"

তিনি বলিলেন, 'এরূপ কিছুই দেখিনা; শুধু আমার সম্বন্ধেই তাঁর এরূপ দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে।"

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম, বৃদ্ধটি আগে মেয়েটির ধারণায় আস্থা স্থাপন না করিলেও মেয়েটির আগ্রহ ও আচরণ দেখিয়া বাধ্য হইয়া পূর্বজন্ম সম্বন্ধে পুঁথিপত্র ঘাঁটিতে আরম্ভ করেন। ইদানীং পূর্বজন্ম সম্বন্ধে তাঁহারও কতকটা বিশ্বাস আসিয়াছে। হিন্দুঘরে পুরুষের পক্ষে দুই তিনবার বিবাহে কোন বাধা নাই বটে, এবং মেয়েটি নিজের মাতাপিতার বাধাও মানিবে না। একমাত্র বাধা অবশ্য বৃদ্ধের দীর্ঘ গার্হস্থ্য-সঙ্গিনী রুগ্না স্ত্রী।

বৃদ্ধ এমন আবেগভরে এইসব কথা বলিয়া গেলেন যে, মনে হইল তিনি নিজের বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধানে অবশ্য তাঁহার দুইবার বিবাহের যোগ নাই। এই কথাটা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বিশ্বাস করিলেন কিনা জানিনা! কাকুতির সুরে বলিলেন, "এর কি কোন প্রতিবিধান নেই?"

আমি বলিলাম, "বিবাহের প্রতিবিধান! শনির দশার প্রতিবিধান শনিকবচ এবং শনির স্তোত্র পাঠ।"

তিনি যেন উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তাতে কি হবে? আমার বর্তমান পত্নী—?"

আমি বলিলাম, "তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হবে; মাথাও ঠিক হয়ে যেতে পারে।"

তিনি একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন, "কিন্তু এই মেয়েটির কি হবে!"

আমি উত্তর দিলাম, "তাঁর সঙ্গে আপনার আর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেম, "আপনি তাঁর অন্তর বুঝতে পারেন নি মশাই! তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! এরজন্যই জানতে চেয়েছি, আমার স্ত্রীর কোন ফাঁড়া-টাড়া আছে কি না?"

বৃদ্ধের মনস্তত্ত্ব বুঝিলাম: তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার কোষ্ঠীতে তা লেখে না। আয়ু-বিচার করতে হলে তাঁর কোষ্ঠীর দরকার।"

তিনি হতাশ হইলেন: কারণ তাঁহার স্ত্রীর কোষ্ঠীঠিকুজী কিছুই ছিলনা। তিনি বলিলেন, "মেয়েটি সত্যই আমাকে বড় সংকটে ফেলেছে! এদিকে ঘরেও শান্তি নাই! আমি করি কি?"

আমি তাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য সান্ত্বনার সুরে বলিলাম: "সত্যই মেয়েটি অভূতপূর্ব চরিত্রের! জেনেশুনে এরূপ বয়সের··· (কথাটা চাপিয়া গেলাম); বর্তমান যুগে এধরণের নিষ্ঠা অর্থাৎ

পূর্বজন্মের পতি মনে করে—” কথা শেষ হইল না ; তিনি হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, নমস্কার !’

তিনি চলিয়া গেলেন ঃ পূর্বজন্মের পতিভক্তির টান দেখিয়া একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও করুণার উদ্রেক হইল ! মঙ্গলকাব্যের বৃদ্ধ ভাঙ্গড় শিব ও আমাদের নবমী গৌরীর কথা মনে পড়িল ! হায়, অনার্স গ্রস্তা তরুণী !!

## মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ

শ্রাবণের সকাল ; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। বড় রাস্তার কাছেই বাড়ী ; ছেলেকে পড়া বলিয়া দিতেছি ; এমন সময় রাস্তায় মোটরের হর্ণ বাজিল। এইরূপ অনবরত বাজিয়াই চলে, গ্রাহ্য করি না। চাহিয়া দেখিলাম, সামনে একখানি গাড়ী থামিল ; কিন্তু আমারই পরিচিত বিদ্বজ্জনমান্য ভাগবতরত্ন মহাশয়কে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। দুই-একবার কোন পত্রিকার কার্যালয়ে তাঁহার সঙ্গে সামান্য আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলাম, হয়ত পাশেই কোন বাড়ীতে কোন প্রয়োজনে আসিয়াছেন। এই পাড়ায় ত কখনও তাঁহাকে কোনদিন দেখি নাই ; যাহা হউক অন্ততঃ বাড়ীর সামনেই যখন নামিয়াছেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসি। উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, তিনি আমারই দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দরজার বাহির হইলাম ; আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া, বাড়ীতেই আছ ; তোমার কাছেই এসেছি।"

নিতান্ত আকস্মিকভাবে তিনি আসিয়া হাজির হইয়াছেন। কস্মিন্‌কালেও আমার গৃহে তিনি পদার্পণ করেন নাই ; এবং তিনি যে কোনদিন আসিতে পারেন, এইরূপ কল্পনাও আমি করি নাই। সুতরাং এইরূপ শ্রদ্ধেয় অতিথির যথাযোগ্য সম্বর্ধনার উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাবে যথেষ্ট সঙ্কোচবোধ করিতেছিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "ভায়া, তোমাকে আমার সঙ্গে একজায়গায় যেতে হবে ; সঙ্গে গাড়ী এনেছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

আমি তাঁহাকে কি ব্যাপারে যে আমার মত লোকের এত জরুরী প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,

"আমি দেশে ছিলাম; কাল সকালে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় এসেছি; তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ।"

আমি বলিলাম, "তারপর এখন কোথায় চলেছেন? বন্ধুটি কেমন আছেন?"

ভাগবতরত্ন মহাশয় বলিলেন, "যাব আর কোথায়, তোর খোঁজেই এসেছি; বন্ধুটি তোমাকে দিয়ে তাঁর কোষ্ঠীটা বিচার করাতে চান।"

আমি উত্তর দিলাম, "সেজন্য এত কষ্ট করে আপনি এসেছেন! লোক মারফত চিঠি লিখলেই পারতেন।" তিনি বলিলেন, "আরে ভায়া, ব্যাপারটা একটু জটিল। কবে একদিন কথাপ্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, একথা তাকে বলেছিলাম; পত্রিকায় লেখ বলেই ত তোমার এত নাম!"

আমি সংকোচের সঙ্গে বলিলাম, "পত্রিকায় লেখা এক জিনিস, আর প্রত্যক্ষভাবে বিচার করা অন্য জিনিস; বিশেষ করে, মরণাপন্ন অসুস্থ ব্যক্তির কোষ্ঠী দেখা এক সমস্যার ব্যাপার।"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "সে যা জান, বলবে: তোমার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, একথাটা মৃত্যুশয্যায় মনে পড়েছে; বড়লোকের খেয়াল!"

আমি বলিলাম, কোষ্ঠীটা সঙ্গে আনলেই ভাল করতেন, আমার যাবার কোন প্রয়োজন ছিলনা।"

ভাগবতরত্ন বলিলেন, "এনেছি ভাই, তাও এনেছি"—এই বলিয়া একটি থলিয়ার ভিতর হইতে একখানি কোষ্ঠী বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আর কিছু নয়, তাঁকে একটু আশ্বাস দিবার জন্যই তোমাকে নিতে এসেছি।"

আমি আরো সংকুচিত হইয়া বলিলাম, "দেখুন মরণাপন্ন রোগীকে কি আশ্বাস আমি দিতে পারি! বিশেষ করে আয়ু গণনা একরূপ জটিল

ব্যাপার ; তা আমি পারব না।”—অবশ্য কোষ্ঠীখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম।

ভাগবতরত্ন বলিলেন, “ভায়া, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি সাহিত্যিক-মহলে তোমার অনেক সুনাম শুনেছি ; সেই দাস-মশাইয়ের সিনেমার দরুণ টাকা পাওয়ার কথাটা।”

উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম, “হাঁত দেখা কিংবা জ্যোতিষ জানলে বন্ধু-বান্ধবকে এমন দু’চারটে কথা বলতে হয় ; তার দু’একটা মিলেও যায়। সেজন্য কারো জীবন-মরণ নিয়ে ত ধাপ্পা দেওয়া চলে না।”

এইবার তিনি ( সম্ভবতঃ তাঁহার মতে ) ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন, “ভায়া, বলেছি ত বড়লোক, দু’চারশো গ্রাহ্যই করে না ; আমি তোমার পারিশ্রমিক দেব।”

সত্য কথা বলিতে কি, পয়সা কড়ির অভাব সত্ত্বেও জ্যোতিষকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করি নাই। বন্ধু-বান্ধব কাজকর্ম করাইলে উপহারস্বরূপ অবশ্য এটা-সেটা উপহার দিয়া থাকেন, পত্রিকার আপিসের চাকরিই সম্বল। আমি ভাগবতরত্ন মহাশয়কে বলিলাম, “টাকার কথা হচ্ছে না ; আমি যা জানিনা বা যে-জিনিস সম্পূর্ণ আয়ত্ত করি নি, আয়ু-বিচারের মত এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি কি মতামত দিতে পারি ?”

ভাগবতরত্ন বলিলেন, “সবই বুঝি ভায়া, কিন্তু কি জানি কেন, তোমার উপর একটা বিশ্বাস ভদ্রলোকের এসেছে। বড় বড় দু’চারজন জ্যোতিষী বলে দিয়েছে, তাঁকে মৃত্যুরোগে ধরেছে। তার উপরে গুরুদেব না কে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ করিয়েছেন। ভদ্রলোকের বাঁচবার বড় সাধ। এর জন্য অনেক কিছু করেছেন ; তুমি চল, দেরি করো না।”

অগত্যা আমাকে যাইতে হইল। মৃত্যুপথযাত্রী ভদ্রলোকের বয়স

খাটের উপর; তিনি বড় ব্যবসায়ী; দেশ-বিদেশে কারবার করেন। দুই বৎসর আগে গুরুদেবপ্রদত্ত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ সত্ত্বেও ভদ্রলোকের স্ত্রী মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান নাই। সুতরাং মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের উপর আর তাঁহার আস্থা নাই।

ভাগবতরত্ন মহাশয়ের অনুরোধ; যে কোন ভাবেই হোক না কেন, ভদ্রলোকের মৃত্যুভয় দূর করিতে হইবে; নতুবা বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তার বৈদ্যি ও বাড়ীর লোকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তারের ডাক পড়ে; আজ ডাক্তার মুখার্জি, কাল রায়চৌধুরী, পরশু সেনগুপ্ত; আজ গ্রহপূজা, পরশু কালীপূজা।

এইরূপ অভূতপূর্ব ব্যাপার শুনিয়া বিস্মিত হইলাম; আধ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্যানশোভিত এক সুন্দর অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জায় বিশেষ আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতেছে। দোতলায় দক্ষিণদিকের একটি ঘরে সেই ভদ্রলোক খাটের উপর অর্ধশায়িত; সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা। কিন্তু যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হইয়া পারিলাম না। বারান্দায় জপ ও হোম হইতেছে; হোমের ধোঁয়া কৌশলে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে রোগীর ঘরে চালিত হইতেছে; উচ্চৈঃস্বরে পাঁচজন ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করিতেছেন—ওঁ জুঁ সঃ—মৃত্যুঞ্জয় শিবায় নমঃ। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি করিয়া ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র হোমাগ্নিতে পড়িতেছে।

ধূম্রজাল ঘরখানিকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত ও কল্পনাতীত ব্যাপার দেখিয়া কৌতূহল বোধ করিলাম। ভাগবতরত্ন বলিলেন, "ভায়া, আজ তিন দিন ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজা ও হোম হচ্ছে; তাতে বরং রোগের যন্ত্রণা বেড়েই যাচ্ছে।"

সেই ধূম্রজালের মধ্যে সুস্থলোকেরই দুই চারি মিনিটের মধ্যে চোখ মুখ জ্বালা ধরিয়া যায়; নিশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হয়। আমি ত অতিষ্ঠ

হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভদ্রলোকের রক্তের চাপ ও বায়ুর উপদ্রব; তার উপর শিরঃপীড়া! ইহার উপর এইরূপ উদাত্ত অনুষ্টুপ ছন্দ ও ধূম্রজাল—কি অবস্থা ঘটিতে পারে, সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তিনি ত হাঁপাইতে ছিলেন। ভাগবতরত্ন মহাশয়েরও এই সকল কাণ্ডে বিরক্তি বোধ হইতেছিল; আমি নেপথ্যে তাঁহার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিলাম। পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিতে বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ হইয়া গেল এবং ধূম্রজাল হইতে রক্ষা পাইলাম।

পীড়িত ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি আর কতদিন এইরূপ কষ্টে বাঁচিয়া থাকিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান জিজ্ঞাসা। আমি তাঁহার কোষ্ঠী আগেই দেখিয়া রাখিয়াছিলাম; কোষ্ঠীখানি তাঁহার সামনে নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলাম,—"আপনার এমন কিছুই হয় নি যে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ পরতে হবে। মৃত্যুরোগ ব্যতীত অন্য সময় এ কবচ ধারণে অনিষ্ট হয়। শাস্ত্রেই আছে—

"কবচস্য প্রসাদেন মৃত্যুর্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
অযথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে॥

অর্থাৎ শিব পার্বতীকে বলিতেছেন, কবচের প্রসাদে মানুষ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু অযথা প্রয়োগ করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে!—আমার উদ্ধৃত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের শ্লোকটি এবং 'অন্যথা'র জায়গায় 'অযথা' জুড়িয়া দেওয়ায় বিশেষ কাজ হইল।

তিনি বলিলেন, "তাহলে আমার মৃত্যুরোগ নয়!"

আমি বলিলাম, "তা হতে যাবে কেন? পঁচাত্তর বর্ষ বয়সে এরূপ যোগ পড়বে; এঁরা পঁচাত্তরকে পঁয়ষট্টি ধরে গোলমাল বাঁধিয়েছেন। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের অযথা প্রয়োগ ঘটেছে।"

রোগী সোৎসাহে প্রায় লাফাইয়া উঠেন আর কি! তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভুল করেছেন না ঢেঁকি করেছেন! আমায় মেরে

ফেলবার যোগাড় করেছেন। এসব বন্ধ কর, এখুনি বন্ধ কর—।" এই বলিয়া কণ্ঠদেশ বিলম্বিত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন; তারপর হাঁপাইতে হাঁপাইতে শান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিঃশব্দে কয়েকমিনিটের মধ্যে ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ করিলেন। ভদ্রলোকটি বড় কড়ামেজাজের। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন; সুতরাং একবার যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহার নড়চড় হইল না। উপস্থিত সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; ভাগবতরত্ন মহাশয় বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হইল।

ঘণ্টাখানেক সেখানে ছিলাম। ধূম্রজাল দূর হওয়ায় এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় ভদ্রলোকের যন্ত্রণা অনেকখানি লাঘব হইয়াছিল।

ইহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; এখনও তিনি বাঁচিয়া আছেন। মাঝে মাঝে স্মরণ করেন; মিষ্টিমুখ করিয়া আসিতে হয়।

ভাগবতরত্ন আমার এই অলৌকিক ক্ষমতার অতিরঞ্জিত কাহিনী এমনভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, মুমূর্ষু রোগীদের আত্মীয়স্বজন আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল।

# ত্রিপাপ

জ্যোতিষে একটা কথা আছে ত্রিপাপ; অর্থাৎ তিনটি পাপগ্রহের মিলন। জীবনকালের প্রত্যেক বৎসরে তিনটি করিয়া গ্রহ-মিলনের একটি তালিকা কোষ্ঠীতে থাকে। রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু এই পাঁচটি গ্রহকে পাপ বলা হয়। যখনই ইঁহাদের যে কোন তিনটি অথবা একটির তিনবার বর্ষমধ্যে মিলন হয়, তখনই ত্রিপাপ বর্ষ ধরা হয়। ত্রিপাপ বর্ষ শারীরিক ও মানসিক পীড়াদায়ক; ইহাই জ্যোতিষশাস্ত্রের মত। জীবনে কত ত্রিপাপ-বর্ষ যায় আসে, কেহ তাহা গ্রাহ্যই করে না। আপদকালেই লোকে কোষ্ঠী-বিচার করে; কোষ্ঠীতে বিশ্বাসীগণের যখনই কোন শক্ত শক্ত অসুখ-বিসুখ হয়, তখনই কোষ্ঠী ঘাঁটাঘাঁটি করেন; কেহ কেহ আবার জ্যোতিষীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিকারও করিয়া থাকেন। খনার বচনে আছে—

যড়দশা তিনপাপ,
এর ছাড়ান নাইরে বাপ।

অর্থাৎ যখন জন্ম সময় হইতে ষষ্ঠগ্রহের দশা আসে এবং তাহাতে ত্রিপাপবর্ষ পড়ে, তাহাতে জীবন-সংশয় হয়। বার্ধক্যই যড়দশার কাল; স্বভাবতই এই সময়ে মৃত্যুভীতি দেখা দেয়। মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য অনেকেই তখন পন্থা খুঁজেন; মানুষ তখনই অতিরিক্ত মাত্রায় দৈবে বিশ্বাসী হয়; কেহ কেহ ধর্মচর্চায় বা পূজা-উপাসনায় বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠেন। বার্ধক্যে মৃত্যুর আশঙ্কা মানসিক বিশেষ দুর্বলতা ঘটায়। এইরূপ অবস্থায় দুর্দান্ত সাহসী ব্যক্তিও নিজেকে নিতান্তই অসহায় ভাবিয়া কিরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, আমাকে তাহারই এক করুণ অথচ হাস্যকর দৃশ্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল ঃ

গ্রীষ্মকাল—দারুণ গরম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; বাড়ীর কাছেই থাকেন অর্থনীতির নামকরা এক অধ্যাপক। নিঃসন্তান ভদ্রলোক; বয়স ষাটের কাছাকাছি। জ্যোতিষে তাঁহার বিশ্বাস নাই; কোষ্ঠীকে বলেন, গোষ্ঠীর মাথা। তবুও তাঁহার গৃহিণী মাঝে মাঝে জ্যোতিষীকে কোষ্ঠী দেখান। ছাত্রেরা এই অধ্যাপক মহাশয়কে বেশ সমীহ করিয়া চলে; কেহ কোনদিন তাঁহার মুখে হাসি দেখে নাই। বড় কড়া লোক; সুখ-দুঃখে নির্বিকার বলিলেও চলে। আমি যাঁহার বাড়ীর একটি অংশে বাসা বাঁধিয়াছি, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক অধ্যাপক মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু; সুতরাং এই বাড়ীতেও তাঁহার যাতায়াত আছে। পাহাড়ের মত দেহ লইয়া যখন তিনি চলেন, তখন মনে হয় দুইপাশের লোকজনকে তিনি উপহাস করিয়া চলিয়াছেন। কথাগুলি কর্কশ ও গম্ভীর। আশে-পাশের সকলেই যেন তাঁহার ছাত্র। একটি ঘটনা গ্রীষ্মের সেইদিন সন্ধ্যার পর আমাকে চমকিত করিয়া তুলিল; তুচ্ছ মানুষ, এমন জাঁদরেল অধ্যাপকের বাড়ীতে আমার ডাক পড়িল; এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান আমাকে বিস্মিত করিল। আমাদের বাড়ীর কর্তার দারোয়ান তথা ভৃত্য শিবশরণই আমাকে ডাকিতে আসিল ঃ ভাড়াটিয়া আমরা সসঙ্কোচে একপাশে পড়িয়া আছি ঃ এইরূপ অবস্থায় নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করাই স্বাভাবিক।

ভৃত্য শিবশরণকে অনুসরণ করিলাম; দুইচারিখানা বাড়ীর পরেই রাস্তার মোড়ে অধ্যাপকের বাড়ী। এই প্রথম এই বাড়ীতে আমার আসা। সসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে দোতলায় উঠিলাম। শিবশরণ তাঁহার শয়ন-কক্ষেই আমাকে লইয়া প্রবেশ করিল। আমাদের বাড়ীর মালিক বৃদ্ধটি একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন ঃ পাশেই একখানি প্রকাণ্ড খাট; খাটের উপরে প্রায় স্তূপাকার লেপ; চোখে পড়িল, সেই স্তূপের একপাশে জাঁদরেল অধ্যাপক মহাশয়ের মুখ দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ

হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, এতক্ষণে বুঝিলাম তিনিই লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে তিনি বলিতেছেন, "কি নরেনদা, তোমার জ্যোতিষী এল? বাব্বা, তিনকেতুর ত্রিপাপ; বলেছিল, তিন কেতুতে জ্বর হয়। তখন গ্রাহ্যই করিনি! জ্বর কত দেখেছ?—১০৭° না?" শিয়রের দিকে বসিয়া বর্ষীয়সী অধ্যাপক-গৃহিণী একহাতে রোগীর মাথায় আইস্-ব্যাগ ধরিয়া আছেন এবং একহাতে পাখা চালাইতেছেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "থাম, বেশি কথা বলো না; তিনি এসেছেন।"

নরেনবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন; আমাকে বলিলেন, "তোমাকে বাবা, অসময়ে বিরক্ত করলাম, প্রেমেনের (অর্থাৎ অধ্যাপক মহাশয়ের) কোষ্ঠীখানা তোমায় দেখতে হবে। কে নাকি কয়েক-বছর আগে বলেছিল, তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিন-কেতুর ত্রিপাপ আছে। আগে ত গ্রাহ্যই করেনি। কত বললাম, 'প্রতিকার কর; গায়ের জোরে কিছুই মানে না। আমি বাবা, আগে-ভাগেই প্রতিকার করে বসি; কি জানি, কখন কি হয়!"

কোষ্ঠীখানা আগেই বাহির করিয়া রাখা হইয়াছিল; নরেনবাবু টেবিল হইতে তুলিয়া তাহা আমার হাতে দিলেন। কোষ্ঠী খুলিয়া একবার চোখ বুলাইলাম, ত্রিপাপের তালিকায় দেখিলাম যে সত্যই ৫৩ তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিন-কেতুর ত্রিপাপ আছেঃ কিন্তু জন্ম-তারিখ অনুযায়ী অধ্যাপক মহাশয়ের বয়স এখন ৫৯ উনষাট। বুঝিলাম ভ্রান্ত ধারণার বশে একটা কিছু গোলমাল হইয়াছেঃ তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা স্যার, চার পাঁচ বছর আগে কি আপনার জ্বর-টর কিংবা অন্য কোন রকম অসুখ-বিসুখ হয়েছিল?"

অধ্যাপক মহাশয় যন্ত্রণাব্যঞ্জক অথচ বজ্রস্বরে উত্তর করিলেন, 'না, বাবা, না! চার-পাঁচ কেন, কুড়ি-ত্রিশ বছরের মধ্যে আমার জ্বর-টর

কেন, কিছুই হয় নি!' আমি তখন বলিলাম, "স্যার, আপনার বয়স এখন ত ৫৯ উনষাট!" তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে বললে? আমার বয়স উনষাট? বল কি?" মুখে অসহায় ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ স্যার, ১২৮৬ সালে আপনার জন্ম। ৯ই ভাদ্র. শনিবার, কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী তিথি—।'

অধ্যাপক মহাশয় সন্দেহের সুরে বলিলেন, "ঠিক করে দেখেছ ত? —ওগো, এটা কি আমার কোষ্ঠী—না আর কারো?"

অধ্যাপক গৃহিণী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "এত জ্বরে তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে; আমি কি তোমার কোষ্ঠী চিনি না? আর, আমার বাড়ীতে আর কার কোষ্ঠী আসবে?

আমি কোষ্ঠীখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম, "......সৌরভাদ্রস্য নবমদিবসে মন্দবাসরে অসিতপক্ষীয় চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ অশেষ গুণালঙ্কৃত-স্বধর্মপরায়ণ শ্রীযুক্তরাজনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ মহোদয়স্য শুভ প্রথমপুত্রঃ পরমকল্যাণীয়ঃ শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনারায়ণ—।" অধ্যাপক মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে; এসব কোষ্ঠী-ঠিকুজীর খবর কি আমরা রাখি বাবা? কবে জন্মেছি, সাল তারিখ এসব কি আর মনে থাকে?

আমি তখন বলিলাম, 'তা হলে এখন আপনার বয়স উনষাট। আর ত্রিপাপ ছিল তিপ্পান্ন বছরে।'

"এ্যাঃ, বল কি?"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি গা ঝাড়া দিয়া লেপগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক দেখেছ ত? হ্যাঁ, আমারই মস্তবড় ভুল হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে চাকরির খাতিরে গোড়ায় যে আমার বয়স ছয় বছর কমান ছিল, তা মনেই ছিল না। তার উপর এখন আবার ইন্‌সিওর কোম্পানীর

ভয় রয়েছে। যাক্ বাঁচা গেল!" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

গায়ের জামা-কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে ঃ ঘর্মাক্ত কলেবর বিরাট বপু যেন স্নানসিক্ত। তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। অধ্যাপক-গৃহিণীর মুখে আশ্বস্ত ভাব দেখা দিলেও তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। আমি অধ্যাপক মহাশয়কে বলিলাম, "করেন কি স্যার? উঠে বসবেন না; এখন বোধ হয় জ্বর ছাড়ছে ঃ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন।"

তিনি প্রায় ভেঙচাইয়া উঠিলেন, "জ্বর না মাথা! দেখলে নরেনদা' তোমাদের জ্যোতিষের কাণ্ড! কোষ্ঠী না ফুষ্টি! যত গোষ্ঠীর মাথা! কৈ তিপ্পান্ন বছর বয়সে ত আমার কিছুই হয় নি! তোমার ত্রিপাপটা তখন কোথায় লুকিয়েছিল; যতসব বুজরুগ্ ---।" হয়ত আমার উপস্থিতির খাতিরে তিনি আর কিছু উচ্চারণ করলেন না।

আমি ভাবিলাম ১০৭°—একশো-সাত ডিগ্রি জ্বরের কথা। "ত্রিপাপ মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু একশো-সাত জ্বর বেমালুম কোথায় অদৃশ্য হল! সত্যই তাঁর গায়ে জ্বর নাই; কিংবা জ্বর কোন ছাপ রেখেও যায় নাই।"

ব্যাপারটা পরে শুনিলাম। সেইদিন অধ্যাপক মহাশয়ের শরীরটা একটু খারাপ ঠেকিতেছিল, সর্দিতে সামান্য রকম গা গরম হইয়াছে। তখন হইতেই মনে হইয়াছে, তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে ত্রিপাপের কথা। বন্ধু নরেনবাবুই এই সন্দেহটা আরও বাড়াইয়া তুলেন। সন্ধ্যায় নরেনবাবু আসিলে এই বিষয়ে আলোচনা হয়; অধ্যাপক মহাশয় বিছানায় শুইয়াছিলেন ঃ বৃদ্ধ অধ্যাপকের মন এই আলোচনায় আরও দুর্বল হইয়া পড়িল। বন্ধুর পরামর্শে তখন থার্মোমিটার আনা হইল, দুই-একবার দিয়া দেখা গেল, উত্তাপ ৯৮° ডিগ্রিও হয় না। অথচ অধ্যাপক মহাশয়ের মনে হইতেছিল, তাঁহার জ্বর অত্যন্ত বেশি।

দুইজনেই বৃদ্ধ, চোখের দোষেও ভুল হইতে পারে! আর অধ্যাপক-গৃহিণী অতশত বুঝেনও না। ঘরে ১৫ 'পাওয়ারের বিজলী বাতির উপর নির্ভর না করিয়া হারিকেন জ্বালান হইল: হারিকেনের প্রায় গায়ে ঠেকাইয়া বারবার থার্মোমিটার দেখা হইতে লাগিল: তবুও সন্দেহ ভঞ্জন হয় না: ইতিমধ্যে থার্মোমিটারের পারদ ১০৭° ডিগ্রিতে গিয়া পৌঁছাইল। জ্বর-নির্ণয় হইল ১০৭° একশো-সাত।

অধ্যাপক মহাশয় ভড়কাইয়া গেলেন: আকস্মিকভাবে তাঁহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইল: তিনি বিছানায় শুইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অধ্যাপক-গৃহিণী একখানির পর আর একখানি করিয়া তিনখানি লেপ তাঁহার উপর চাপা দিলেন। তথাপি যন্ত্রণার উপশম নাই; অধ্যাপক শুধু চীৎকার করেন, "বাবারে, গেলুমরে, জ্বলে গেল, গা পুড়ে গেল, পায়ে মোজা দাও, মাথায় বরফ দাও—; ডাক্তার চক্রবর্তীকে ডাক—"

ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু নরেনদা' জ্যোতিষীকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন।

# অভিশপ্ত

লোকের গ্রহলিপি পাঠ করিতে হয়। সম্মুখে সুন্দর তরুণ; উজ্জ্বল মুখশ্রীতেও বিষাদের কালি মাখানো। অল্প বয়স; কথাবার্তায় একটা সংকোচ ও আতঙ্কের ভাব রহিয়াছে। পাছে কেহ শুনিয়া ফেলে এই ভয়! না আরও কিছু! সুন্দর হইলেও শুকনো তাঁহার চেহারা! কলেজে পড়ে সে; তার উপর এই দুর্ভাবনা! কাহার অভিশাপে বা কোন্ কৃতকর্মের জন্য এই দুর্ভোগ! ভৃগু-পরাশর মাথা ঘুলাইয়া দেয়; এই কি গ্রহলিপি! এই কি প্রাক্তন!

উত্তর দেই, "তোমার চিঠি পেয়েছি বাবা, আমি কি করতে পারি? 'কি উপায়ে তুমি বড় হয়ে উঠতে পার!'—এই ত তোমার প্রশ্ন? তুমি ঠিক পথই ধরেছ; তুমি মানুষ হয়ে উঠতে পারবে।" তাঁহার চিঠির লেখাগুলি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ঃ তাঁহার চোখে মুখে যেন চিঠির হরফে লেখা ঃ

"......ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি; কিন্তু মনের স্বাভাবিক অবস্থাটুকু হারিয়ে ফেলেছি বলে তিনবার ফেল করলাম; আবার পড়ছি। মনে হচ্ছে, আমার জীবনে সাফল্য কোনদিন আসবে না। কারণ আমি অভিশপ্ত! আমার স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। চেয়েছিলাম লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে। চেয়েছিলেম— যশ, মান ও ঐশ্বর্য। নিজেকে সুখী করার চাইতে মাকেই সুখী করব বলে টিকে রয়েছি কোন রকমে! অনাহারেও কাটাতে হয় মাঝে মাঝে!"

তরুণের মুখের দিকে তাকাই! আভিজাত্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া এ যেন কথা বলিতেছে! অভিশপ্ত বিদ্রোহী! পুরাতনকে অভিশাপ দেয়—নিজের অভিজাত বংশমর্যাদাকেও। শত শত তরুণের মুখ ভাসিয়া উঠে ওই তরুণের মুখে ঃ চিঠিখানি আরও উজ্জ্বল হইয়া

উঠে ঃ লজ্জায় যাহা মুখে বলিতে পারিবে না, তাহাই আগে চিঠিতে লিখিয়াছে ঃ

"......অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিশালী নাগরিক হিসাবে যে বংশ আজও এ অঞ্চলে বিশেষ সুপরিচিত ; আমি ঐ বংশেরই একমাত্র বংশধর। আমার প্রপিতামহ ছিলেন বিশাল এবং বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। বংশরক্ষার সংকল্প নিয়ে তিনি তাঁর অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র এবং উদ্ধত প্রকৃতির নাতিটিকে বিয়ের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করলেন। কিন্তু মা আমার জীবনে সুখী হল না।......"

আমার সম্মুখে বাংলার পুরাতন অভিজাত বংশের প্রতীক তরুণটি নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার চোখে-মুখে প্রশ্ন যেন ফুটিয়া উঠিতেছে—"আমি কি বড় হব? আমার মায়ের দুঃখ কবে ঘুচবে?" আর আমার চোখে ভাসিতেছে সেই চিঠি ঃ

"......শৈশবেই আমাকে পরলোকে পাঠানোর আয়োজন করেছিলেন আমার বাবা। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে বেঁচে উঠেছি। মার স্নেহটুকুই আজ আমার একমাত্র পাথেয়! সংসারের উপর দিয়ে কত দুর্যোগ বয়ে গেল! বাবার বীভৎস তাণ্ডবে সমস্ত সংসারে আগুন জ্বলে উঠল! দাদু (পিতামহ) জীবিত অবস্থায় বাবার হাতে নির্যাতিত হয়ে পরলোকের পথে পা বাড়ালেন। সুতরাং বাড়ী, গাড়ী আর বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে বাবা আজ যথেষ্ট গর্বিত।..."

সেই গর্বিত জমিদার-নন্দনের অভিশপ্ত বংশধর আমার সম্মুখে। নিতান্ত অসহায় ; প্রতিবেশী সজ্জনের কৃপায় তাঁহার অন্ন জুটে ; তাঁহাদের সহায়তায় কলেজে পড়ে ; পত্নী ও পুত্রের দুর্গতিতে পিতার কত গর্ব! কত উল্লাস! হিংস্র মানবের এক বিকটরূপ আমার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

"......শাসনের অজুহাতে মাকে নিয়মিত লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে হচ্ছে আজ। মারধোরের ব্যাপারটা চরমে উঠলে আমিও একটু অসহ্য হয়ে উঠি! চোখের জল ছাড়া মার আর কোন সম্বল নাই। এত দুঃখের মাঝেও তাঁর আশা অনেক—আমি বড় হব! মানুষ হয়ে তাঁর দুঃখ ঘুচাব! এদিকে সংসার একেবারে অচল। আমাদের ভরণপোষণের জন্য বাবা একটা পয়সাও দেন না। প্রতিবেশীর দয়ার উপর নির্ভর করেই কোনমতে চলে যাচ্ছে আমাদের। ইস্কুল ছেড়ে কলেজেও ঢুকেছি এইভাবে।......"

দুর্দান্ত অভিজাত-বংশীয় অশিক্ষিত জমিদারেব নগ্নরূপ আমাকে বিস্মিত করিল! অনেকেরই সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কথা আমাকে শুনিতে হয়! আবার আশ্বাসও দিতে হয়! আমার সম্মুখে এই তরুণ! মস্তকে তাঁহার প্রাচীন আভিজাত্যের গুরুভার না অভিশাপ!

"......ছেলেবেলায় আমার ছোট্ট বোনটি সংসারের এই বীভৎসরূপ দেখে সরে পড়েছে। তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের কাছে মাকে পতিতা প্রতিপন্ন করবার সে কি বিরাট ষড়যন্ত্র! আজ ওসব অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই পাগলের মত খানিকটা বকে গেলাম।..."

উৎসন্ন এক জমিদার যেন দূরে দাঁড়াইয়া মাতালের মত টলিতেছেন। তরুণের দীর্ঘশ্বাসে আগুনের হল্কা! শিশুকন্যা যোগমায়ার অভিশাপ-বাণী আকাশে ভাসিতেছে। জ্যোতির্লিপি হাহাকারে ভরিয়া উঠেঃ—'আমি বড় হয়ে মায়ের দুঃখ ঘুচাব।'

"......জমিজমা আর জমিদারী প্রায় বিক্রি করে ফেলেছেন বাবা! সুতরাং ভবিষ্যতে ওসবের আশা আমি করি না। কিন্তু কি উপায়ে আমি বড় হয়ে উঠতে পারব? বলতে পারেন?..."

তরুণের জন্মকুণ্ডলী আমার সম্মুখে! উত্তেজনা ও ক্ষোভে চোখে

জল আসে! "নিশ্চয়ই তুমি পারবে; মানুষের মত মানুষ হয়ে মায়ের দুঃখ ঘুচাতে পারবে, অত অধীর হয়ো না!"

তরুণ উত্তর দেয়, "আমার মনে হয়, আমি অভিশপ্ত! আমি সুখী হতে পারব না! নতুবা এ বংশে আমার জন্ম হতো না! ওদের পাপের বোঝা আমাকে বইতে হবে! আমার দুঃখিনী মায়ের অশ্রু মুছাতে পারব না!"

তরুণটি চলিয়া যায়! ভাবি—এই কি গ্রহলিপি! এই কি প্রাক্তন?

## সর্বসিদ্ধি-কবচ

একখানি চিঠি পাইলাম ঃ

...কোন ধনী-পরিবারে বিবাহ করিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চাই। ধনী-পরিবারের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু কোন সুযোগ পাইতেছি না। কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে জানাইয়া বাধিত করিবেন!......ইহা না হইলে আমার আত্মহত্যা করিতে হইবে। মাতা অন্ধ, ছোট ভাই জন্মের মত খোঁড়া। আর চালাইতে পারি না। সে কারণ আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।...... বিশ্বাস করিয়া অনেক জায়গায় প্রতারিত হইয়াছি। বড় আশা লইয়া আপনার স্মরণ লইলাম। কার্যসিদ্ধি হইলে আপনাকে ভুলিব না। এই সঙ্গে আমার ঠিকুজীর নকল দিলাম। আগামী বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। ইতি ...

আত্মহত্যা! মনে মনে হাসিলাম। এইরূপ আত্মহত্যা আমাদের অহরহ চলিতেছে। 'অমুক কাজ সিদ্ধ না হইলে আমি আত্মহত্যা করিব'; 'অমুকের সঙ্গে বিবাহ না হইলে আমি পাগল হইয়া যাইব'— লিখিত ও বাচনিক এইরূপ আবেদন-নিবেদনের সম্মুখীন জ্যোতিষীকে প্রায়ই হইতে হয়! কিন্তু এইবার একটু নূতন ধরণের! "মাতা অন্ধ, ছোট ভাই জন্মের মত খোঁড়া!" আর তাহাদের একমাত্র যষ্টি পত্রলেখক শ্রী......মুখোপাধ্যায়।

ঠিকুজীর নকল দেখিয়া বুঝিলাম পত্রলেখক যুবক; বয়স পঁচিশ বৎসর কয়েক মাস। আশার মোহে অসম্ভব কল্পনা কে না করে! 'যদি আমি হতে পারি, হতে পারতাম কিংবা যদি পেতাম'—এইরূপ "যদি" কে কেন্দ্র করিয়াই মানুষ জীবন-চক্রে ঘুরিতেছে। যুবকটির

দোষ নাই ; ধনী-পরিবারে বিবাহ করিয়া দৈন্য ঘুচাইতে চায় ! তারুণ্যের মোহে নহে; বাস্তব প্রয়োজনে তাঁহার মতে সহজ পন্থা ধনী-পরিবারে বিবাহ !

আমি জ্যোতিষী ; এই ব্যাপারে আমি তাঁহাকে কি সাহায্য করিতে পারি ! একমাত্র যদি পাত্রী-পক্ষ হইতে উভয়ের যোটক বা বিবাহ-মিলনের ভার আমার উপর পড়ে, তাহা হইলে যোটক-মিলন হইয়াছে কিনা বলিতে পারি ! বড়জোর "এই যুবকই পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র, রাজযোটক, বিবাহে পরমসুখ, পাত্রীর কোষ্ঠীর দোষ একমাত্র এই পাত্রের সঙ্গে বিবাহে খণ্ডিত হইবে, প্রজাপতির নির্বন্ধ···ইত্যাদি" বলিতে পারি ! কিন্তু যুবকটি কি চায় ? দৈবশক্তির সাহায্যে বা দৈবকর্মাদির দ্বারা এই বিবাহ ঘটাইয়া দিতে হইবে ? হ্যাঁ, মনে পড়িল ঃ দৈব যে জ্যোতিষীর কথা শুনে !!

ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার আসিয়া গেল। যুবকটির কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। সকাল বেলাই আমার অধ্যাপকবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয় আসিয়া আসর জমাইয়াছেন। তিনিও জ্যোতিষ আলোচনা করেন। সাধারণভাবে জ্যোতিষের কোন সূত্র ধরিয়া আরম্ভ করিলেও নিজের সম্বন্ধেই তাঁহার অধিক চিন্তা ! তিন বৎসর ধরিয়া তাঁহার লগ্ন-সম্বন্ধে প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করিয়াছেন ঃ কিন্তু আজও তাহার সমাধান হয় নাই ; সম্ভবতঃ কলিকাতার ছোটবড় অধিকাংশ জ্যোতিষী তাঁহার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন ঃ কিন্তু তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারেন নাই। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বাজারে লভ্য জ্যোতিষের প্রায় সকল বইই তিনি পড়িয়া ফেলিয়াছেন !

ইদানীং কে এক ভৃগুশাস্ত্রী বলিয়া দিয়াছে, একাদশে শনি আছে ঃ এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি লক্ষপতি হইবেন ! ভৃগুবাক্য মিথ্যা হইতে পারে না ! তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ঃ

ভৃগুশাস্ত্রী অতীত হুবহু মিলাইয়া দিয়াছেন ; সুতরাং ইহা ধ্রুব সত্য ! ভৃগুবাক্য সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, যতদিন পর্যন্ত ইহার সত্যমিথ্যা প্রমাণিত না হইবে, ততদিন আমারও নিস্তার নাই ! দুইবৎসর পরেই শনির দশা ! অন্ততঃ দুইবৎসর দুর্ভোগ রহিয়াছে !

অধ্যাপক চক্রবর্তী বিজ্ঞানের ছাত্র ! মাথাও তাঁহার পরিষ্কার ! দুইশত টাকার উপর যাহার মাসিক আয় নহে, তিনি বছর দুইতিন পরে হঠাৎ লক্ষপতি হইবেন ! ইহাও এক সমস্যা ! শনি তাঁহার মাথা ঘোলাইয়া দিয়াছে ! ভৃগু যাহাই বলুন না কেন, এখন পরাশর মতে তাহা পাওয়া যায় কি না—দেখিতে হইবে ! আমার সঙ্গে তাহারই আলোচনা চলিতেছে ! অধ্যাপক বন্ধু জ্যোতিষের বই বাহির করিয়া আমাকে পড়াইয়া শুনাইলেন ঃ

সূর্যাত্মজে লাভগতে মনুষ্যো ধনী বিতৃষ্ণো বহুভোগভোগী ।
গীতানুরাগী মুদিতঃ সুশীলঃ স চাল্পকালে ভবতীব রোগী ॥

তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আমার বেলা সবই খেটে যাচ্ছে ঃ আমার তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা বিশেষ নাই ; গান বাজনাও ভালবাসি ঃ অবশ্য গান বাজনা আমি করি না, যা পাই তাতেই আমি সন্তুষ্ট ; আমার সম্বন্ধে খারাপ কেউ কিছু বলতে পারবে না। ছোটবেলা থেকেই আমার শরীর ভাল যায় না !"

ছোট ছেলের মতই অধ্যাপক বন্ধু কথাগুলি বলিয়া গেলেন ঃ "একথা কি মিথ্যা হতে পারে ? নিশ্চয়ই শনির দশায় এর ফল পাওয়া যাবে ! বিশেষতঃ আমার যখন বৃষলগ্ন ; শনি একাই রাজযোগ কারক গ্রহ !"

এই লগ্ন লইয়াই যত গণ্ডগোল ! তাঁহার লগ্ন কখনও বা মেষ, কখনও বা বৃষ হয় ! জন্ম সময় সম্বন্ধে সঠিক তাঁহার জানা নাই ; জ্যোতিষ-বচনের সঙ্গে নিজের অতীত ঘটনা মিলাইয়াও এই সন্দেহের

নিরসন হয় না। হস্তরেখা-বিশারদ-পণ্ডিত ভট্টাচার্যও দুইবার দুইরকম বলিয়াছেন! ভৃগু-পরাশর, জ্যোতিঃশাস্ত্রী কিংবা জ্যোতির্ভূষণ কেহই এই লগ্ন-সমস্যা সমাধান করিতে পারেন নাই। শুধু "বিকালে জন্ম" এই সূত্র হইতে তাহার মীমাংসা কে করিবে! অধ্যাপক বন্ধুকে বলিলাম, "এতদিন যা সমাধান হয় নাই, দু'বছর পরে শনিই তার সমাধান করবে।"

ইতিমধ্যে রুক্ষ চেহারার একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে নমস্কার করিল ঃ বলিল, "আপনার সঙ্গে আজ দেখা করার কথা ছিল।"

আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম ঃ বলিলাম, "আপনার সঙ্গে? তা' আপনার নাম?"

যুবকটি বলিল, "আমি চিঠি দিয়াছিলাম। আমার নাম শ্রী...... মুখোপাধ্যায়।

মনে পড়িল সেই চিঠির কথা। যুবকটির চেহারায় ও বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ পড়িয়াছে। মুখে তারুণ্যের চিহ্নমাত্র নাই; গালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে ঃ তাহার উপর গায়ের রঙ ময়লা। বাম কাঁধে একটি কাপড়ের বড় থলি ঝুলিতেছে। নানা সম্ভারে থলিটি পূর্ণ বলিয়া মনে হইল! থলির মুখে লাল নীল প্যাকেট ও ধূপকাঠি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে।

আমি বলিলাম, "ওঃ, আপনি চিঠি লিখেছিলেন; বেশ, বসুন! আপনার ঠিকুজী দেখছি।"

ফাইল হইতে চিঠিখানি বাহির করিলাম। ঠিকুজীখানিতে চোখ বুলাইয়া বলিলাম, "আপনি কি করেন?"

যুবকটি বলিল, "বুঝতেই পারছেন, প্রাণের দায়ে ফেরি করে বেড়াই; এই ধূপকাঠি, তরল আলতা, স্নো, পাউডার, তানসেন গুলি, আশ্চর্য মলম—"

ট্রেনের কামরায় যেন বক্তৃতা শুনিতেছিলাম ঃ বাধা দিয়া বলিলাম,

'যাক বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা ! এরকম পরিশ্রম করে তিন তিনটে লোকের পেট চালানো শক্তই বটে !”

যুবকটি উত্তর দিল, “পরিশ্রম কিসের ! এসব আমাদের সয়ে গেছে। চুপ করে থাকতে পারি না ! ফেরি করে বেড়ানোতেই আমাদের আনন্দ। যতক্ষণ বাইরে থাকি, বেশ থাকি। কিন্তু সারাদিনের পর মহাজনকে টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে যখন টাকা দেড়েক কিংবা সিকি আধুলি নিজের ভাগে পড়ে, তখনই হতাশ হয়ে পড়ি ঃ বাড়ী ফিরে আবার অন্ধ মা আর খঞ্জ ভাই !”

অধ্যাপক বন্ধু চুরুট ধরাইলেন ; তিনি বলিলেন, “এরকম করেই লোকে বড় হয় ; জান না, আমেরিকার সেই রকফেলারের কথা ! সেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন— !”

যুবকটি উত্তর করিল. “সে আর কয়জন হতে পারে ? আমাদের কারবারেও বেশ লাভ আছে ঃ কিন্তু মূলধন না থাকলে কিছুই হয় না ; ক্যাপিটেলের অভাবেই ত একজন ফড়ের কাছ থেকে মাল আনতে হচ্ছে ! তা না হলে ডিরেক্ট কোম্পানী থেকে— ।”

আমি বলিলাম, “আচ্ছা, আমি আপনাকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি ?”

যুবকটি বলিল, “আমার কোষ্ঠী নিশ্চয়ই দেখেছেন , লোকে বলে —'স্ত্রীভাগ্যে ধন' । আমার কি সেরূপ কোন যোগ আছে ! অথবা লটারী কিংবা কারো সম্পত্তি-টম্পত্তি !

তাঁহার জন্মকুণ্ডলীর উপর চোখ বুলাইয়া বলিলাম, “সে রকম জোরালো কোন যোগ দেখি না ! তবে আপনার বিয়েটা ভালই হবে ! স্ত্রী ভাগ্যবতী বলা চলে !”

যুবকটি বলিল, “আচ্ছা, এসব আমি অনেক শুনেছি স্যার ! এর কি কোন প্রতীকার নাই ?”

আমি বলিলাম, "কিসের প্রতীকার ? কোষ্ঠীতে কোন অনিষ্টকর যোগ থাকলে এটা সেটা প্রতীকারের ব্যবস্থা রয়েছে ; ফল যে সব ক্ষেত্রে হয়, তা বলা চলে না।"

যুবকটি বলিল, "আমি সেরকম প্রতীকার চাই না। ধরুন, এই সর্বমঙ্গলা, সর্বসিদ্ধি, কিংবা কুণ্ডেশ্বরী কবচের মত কিছু, যাতে করে সবই সিদ্ধ হয় !"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এরকম কিছুই আমার জানা নেই ; এবং অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করবার কোন ব্যবস্থাও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নাই।"

যুবকটি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কেন থাকবে না স্যার ! এগুলি কি মিথ্যা ? আমি নিজে কবচ-তন্ত্র পড়ে দেখেছি—"

এই বলিয়া পকেট হইতে একতাড়া পঞ্জিকার পাতা জাতীয় কতকগুলি বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া আমার হাতে দিল : প্রথমেই চোখে পড়িল :

**সর্বসিদ্ধি-কবচ**

"পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব সমাবেশ! ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া মন্ত্রপূত এই কবচ ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরিপ্রাপ্তি, কর্মোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত করা, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ অনায়াসে করা যায়। বংশরক্ষা হয় ; ভূত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত-গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্রও ধনবান্ হইয়া থাকেন। মূল্য মাশুলাদি সহ—৫৷৷/০ পাঁচটাকা নয় আনা।"

তারপর আরও আছে ; এই রকমের বিজ্ঞাপন দেখিলে অতি দরিদ্র কেন, অনেক অতি ধনবানেরও মন কেমন কেমন করে ! এইরূপ ব্রহ্মাস্ত্রে আমাদের পঞ্জিকার কলেবর পুষ্ট ! সারা দেশটা জুড়িয়াই ভূত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও ডাকাতেরা বিরাজ করিতেছে ! কলেরা, বসন্ত, প্লেগ— যখন-তখনই দেখা দেয় ! মামলা-মোকদ্দমা ত লাগিয়াই আছে ! বিশেষতঃ যে দেশে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই অতি দরিদ্র এবং চাকুরিপ্রার্থী,—তখন এইরূপ সর্বসিদ্ধি-কবচের মরীচিকা মোহগ্রস্ত করিবে বৈ কি ! যুবকটিকে বলিলাম, "সর্বসিদ্ধি-কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন !"

যুবকটি বলিল, "ধারণ করে দেখেছি ঃ এটা কেন, বশীকরণ কবচও দেখেছি ঃ কোন ফল হচ্ছে না ।"

আমি বলিলাম, "তাহলেই বুঝতে পারছেন ; এতে কিছুই হবে না। আমি এখন কি করতে পারি ?"

যুবকটি বলিল, 'আপনার কাছে তাইত এসেছি ঃ আপনি অনুগ্রহ করলেই আমার সমস্ত সন্দেহ মিটে যায় ?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "যারা কবচের বিজ্ঞাপন দেয়, এরূপ কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নেই ! আর কবচ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারব না ।"

যুবকটি বলিল, 'আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে আবার পরীক্ষা করতে পারি ! আমার মনে হয়, শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না ; আমি কবচ-মালার বই পড়ে দেখেছি ঃ আমার মনে হয়, ওরা ঠিক ঠিক জিনিস তৈরী করতে পারে না ;

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যতে বন্ধনাৎ ।
সর্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥

—এসব ঋষিবাক্য ; স্বয়ং মহাদেবের উক্তি ! শাস্ত্রের যথাযথ

নিয়মে কবচ করলে নিশ্চয়ই ফল দেবে! আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "আমি ত কবচ করতে জানিনা; আপনি বরং অন্যত্র চেষ্টা করুন।"

আমার অধ্যাপক-বন্ধু বলিলেন, "আপনি স্ফটিক ধারণ করে দেখুন।"

যুবকটি বলিল, "রত্নে এত কাজ হয় না? সর্বসিদ্ধি-কবচ কিংবা বশীকরণ-কবচ আমার দরকার। এই ধরুন না, আমি যেখানে বিয়ে করব ঠিক করেছি, তাঁদের একটি মাত্র মেয়ে! বড় কারবারী লোক, বিস্তর পয়সা। অন্য ছেলেমেয়ে নেই! এত পয়সা খাবে কে?"

আমি বলিলাম, "বড়লোক যখন, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের মতন বড় লোকের ছেলেই খুঁজবে।"

যুবকটি বলিল, "খুঁজছে অবশ্যি তাই! কিন্তু পাবে কোথা? মেয়েটি দেখতে তেমন ভাল নয়! বসন্তে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে; বিয়ের বয়স প্রায় পেরিয়ে গেছে; এরকম মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইছে না।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি চেষ্টা করেছেন?"

যুবকটি বলিল, "চেষ্টা করেছি বৈ কি? কিন্তু কোন ফলই হচ্ছে না! তাঁরা আমাদের স্বশ্রেণীর; আমি কোন অসম্ভব দাবীও করছিনা! তাই বশীকরণ কবচের সাহায্যে যদি কিছু করা যায়!"

আমি বলিলাম, "বিজ্ঞাপনের মোহে ঠকলেন ত? তবুও এর মোহ কাটাতে পারেন নি?"

যুবকটি বলিল, "দেখুন স্যার, আমি ত আসল জিনিস পাই নি! আপনাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে'—এই বলিয়া যুবকটি আমার পায়ে ধরিতে গেল। তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "করেন কি?

করেন কি ? শাস্ত্র মিথ্যা তা আমি বলছিনা ; কিন্তু এসব ক্রিয়াকর্ম্ম ও জপতপ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই।”

যুবকটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, “আমাকে তা বিশ্বাস করতে বলেন ? সাধনার জোর বা যৌগিক বল না থাকলে এরকম সপ্তাহে পাঁচশো লোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়! কক্ষণোই হতে পারে না! আচ্ছা, লালমোহন বাবুর নাতির এমন শক্ত অসুখ, আপনি ত জল ছিটিয়ে ভাল করে দিলেন!”

আমি এইবার বিপদ্ গণিলাম ঃ জ্যোতিষী করি ; জ্যোতিষী-মাত্রেরই অলৌকিক ক্ষমতা আছে, এ বিশ্বাস অনেকেরই থাকে! তাই ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ হলে বন্ধুবান্ধব নাছোড়বান্দা হইয়া ধরেন। “ভাই, একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে দাও, তুমি ত আর বুজরুগি করবে না ; তুমি একটা কিছু করলে ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে।” আগে রাগ করিতাম ; রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতাম! কিন্তু একবার মর্ম্মান্তিক এক ঘটনা ঘটে ; এক বিধবার একমাত্র পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য এমনি এক ডাক আসে ; কিন্তু অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁহাদের বিদায় করি! ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু বিধবামাতা এখনও বলেন, ‘উনি যদি এসে ছুঁয়ে দিতেন, আমার ছেলে মরত না!’ সেই দিন হইতে অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা বড় করি না! বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্য অনুরোধ আসিলে গিয়াও থাকি ঃ প্রাণের ঠাকুরকে বলি, “ঠাকুর বাঁচিয়ে দাও।”

যুবকটিকে বলিলাম, ‘দেখুন, সে অন্য ব্যাপার, সত্যই তাতে কোন অলৌকিক ব্যাপার নাই!’

যুবকটি বলিল, “এটা একটা মস্ত বড় কাজ! দেশের ,আপনি কত উপকার করছেন! আপনাদের মত লোক যদি কবচ-মাদুলির সংস্কারে ব্রতী হয়, তাহলে দেশের কত উপকার হয়!”

অধ্যাপক-বন্ধু বলিলেন, "দেশের উপকার! সে আবার কি রকম?"

যুবকটি বলিল, "আপনারা নিশ্চয়ই জানেন—শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হতে পারে না ঃ আপনারা একটু চেষ্টা করলেই দেশের দুর্গতি দূর হয়! অকালমৃত্যু, মারীভয়, বেকার সমস্যা ও চাকরিপ্রাপ্তি—সব ব্যবস্থাই আমাদের সনাতন শাস্ত্রে রয়েছে!"

যুবকটির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম: এইসব কবচ-মাদুলিতে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে! তাঁহার মতে তথাকথিত নিয়মে এইগুলি প্রস্তুত হইলে দেশের সমস্যা দূরীভূত হইয়া যাইবে! এখন ইহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা! যে কোন ভাবে যুবকটিকে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। নতুবা মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে! যুবকটিকে বলিলাম, "দেখুন, এসব অতি শক্ত ব্যাপার; কবচ-মাদুলি তৈরী করবার উপযুক্ত সাধকেরই অভাব: নির্লোভ, শাস্ত্রজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় তান্ত্রিক সাধক না হলে এসব কবচ তৈরী করবে কে?"

যুবক বলিল, "তা বুঝি স্যার, গোটা তন্ত্রসারখানা পড়ে ফেলেছি ঃ কিন্তু গুরু পাওয়া ভার! লোকের কথা শুনে বিষ্ণুপদ ঠাকুরের কাছে গেলাম ঃ ওরে বাবা, সেখানে যা লোকের ভিড়! বসে আছি ত বসে আছি; তারপর টালিখাতা নিয়ে একজন এসে নাম, ঠিকানা আর কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে লিখে নিলেন; অগ্রিম দক্ষিণা চাইলেন ৩।/৫ তিনটাকা সওয়া পাঁচ আনা!"

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কি হল! উনি কি কোষ্ঠী দেখেন?"

যুবকটি উত্তর দিল; "না স্যার, তারপর এক এক জন করে ভিতরে ডাকে; বারোটা বেজে গেল! আমার আর ডাক হয় না! যিনি নাম লিখে নিয়েছিলেন. তাঁকে বলতে তিনি বললেন, 'দেখুন,

এক এক জন করে ডাকছেন ; আপনাদেরই কাজ হচ্ছে ! সবুর করুন, না হয়, কাল আসবেন। আপনার তারিখটা না হয়, কাল প্রথমদিকে ফেলে দিতে পারি !'

অধ্যাপক-বন্ধু বলিলেন, "কি ! এততলোক সেখানে যায় ?" যুবক বলিল, 'যায় বৈ কি স্যার ! যাক সেদিনই আমার ডাক পড়ল ; বিষ্ণুপদ ঠাকুর একখানি স্লেট নিয়ে আঁক-জোঁক কেটে বললেন ; 'তোমার কোন জিনিস চুরি যায় নি ত ?' আমি বলিলাম, 'না, আমি চুরির কথা জানতে এখানে আসিনি ;' 'সর্বসিদ্ধি-কবচের কথা বলিলাম ; তিনি বললেন, 'তা জানি, কিন্তু নিশ্চয়ই তোমার কোন জিনিস চুরি গেছে, বাড়ী গিয়ে দেখবে ! কবচ নিজ শিষ্য ছাড়া অন্যকে দেওয়া চলেনা ঃ আর তোমার কি প্রয়োজন,—তা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। কাজেই তুমি যা চাইবে, তা-ই যে দেব—এরূপ ধারণা করতে পার না।' বিষ্ণুপদ ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম ; সেখানে চুরি, ছেলে হারানো, চাকরি-যাওয়া ও তহবিল তছরূপে জেলে যাবার আশঙ্কা যাঁদের তাঁদেরই ভিড় !"

আমি বলিলাম, 'সৎভাবে নিজের কাজ করুন ; উন্নতি হবে। আপনি যদি স্তোত্র-কবচে এতই বিশ্বাসী তা' পাঠ করতে পারেন !'

যুবকটি বলিল, "পাঠ করছি বৈকি, সংস্কৃত ভাল পড়তে পারি না ; তাই আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশাইকে কত তোষামোদ করে পড়াটা কতক আয়ত্ত করে ফেলেছি।"

আমি বলিলাম, "বেশ, নিশ্চয়ই ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন।"

যুবকটি বলিল, "এক বছর হয়ে গেল, তার কোন লক্ষণই দেখছি না স্যার ! ভদ্রলোক ঘরজামাই রাখতে চায় ; আমার অন্ধ মা, আর খঞ্জ ভাই আমার কাল হয়েছে ! তাঁদের ত ত্যাগ করতে পারি নে।"

আমি অভিশপ্ত অন্ধ মাতা ও খঞ্জ ভ্রাতার কথা ভাবিতে লাগিলাম, সাফল্যের পথে তারাই এখন প্রধান কণ্টক! যুবকটিকে বলিলাম, "আমার মতে প্রত্যহ কালীমায়ের পায়ে আটটি করে নীল অপরাজিতা ফুল দিয়ে যান, তাতে উপকার পাবেন!"

যুবকটি বলিল, "হাঁ, ঠিক কথা মনে করিয়ে দিলেন; আপনি এরকম লিখেন বটে; ভেবেছিলাম, আপনাকে জিজ্ঞেস করব: এতে কি ফল হবে?"

এইরূপ সহজ প্রতিকারের নির্দেশ আমাকে দিতে হয়; জ্যোতিষী করি; মানুষের মঙ্গলের চিন্তা আমার কর্তব্য। "নীল-অপরাজিতা— নীলা, রক্তমুখী, ইন্দ্রনীল-রত্নের রঙ্, দুঃখদাতা গ্রহ শনির বড় প্রিয় রঙ, দুর্গার অপর নাম অপরাজিতা! নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল হবে।"

কথাগুলি শুনিয়া যেন যুবকটি কতকটা ভরসা পাইল! আমাকে বলিল, "আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু কতদিন দিতে হবে?"

আমি বললাম, "মাস তিনেক দিয়ে যান, তারই মধ্যে ফল পাবেন। আপনার অমঙ্গল দূর হবে।"

যুবকটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। চলন্ত ট্রেনের কামরা যেন আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। কাঁচা, পাকা নানা ধরণের কতকগুলি মুখ! আশ্চর্য দ্রব্যগুণ আর অভূতপূর্ব ঔষধের মহিমাকীর্তন। পান-বিড়ি, চানাচুর, গরম-চা!

# অবিশ্বাস্য

আগন্তুক সত্যশরণবাবু গল্প করিতেছেন ঃ

সুশোভিত কক্ষ ; প্রবেশদ্বারে অন্যকক্ষে সুশোভিত নবকলসী নবগ্রহের প্রতীক। জ্যোতিষীর বৈঠকখানা ; জ্যোতিষীর ললাটদেশ সিন্দূরতিলকে দেদীপ্যমান, রেশমী চাদর স্কন্ধদেশে অযত্নে এলায়িত। তিনি টেলিফোনে কথা বলিতেছন ঃ

ও, কে ? রাণীমা !—হ্যাঁ, তাত হবেই। গাড়ীর তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন ! বলেন কি ? আর একটু হ'লে পা দুখানা— ! হ্যাঁ, মনে পড়ছে বৈকি ?—হ্যাঁ, তিনমাস আগে আমিই ত বলেছিলাম ঃ —ঠিক ঐ তারিখেই ঘটেছে !! খোকাবাবু বুঝি ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন ! না, না, অবিশ্বাস হবার কথাই ত ! এঁরা আধুনিক লেখাপড়া জানা ছেলে কি না ? এঁদের বিজ্ঞান এসব স্বীকার করে না ! হাঃ,—হাঃ—হাঃ ( উচ্চহাসি ) !—কি বললেন, মাদুলিটা হাতেই ছিল। জোর করে পরিয়ে দিয়েছিলেন ; ঠিকই হয়েছে। নিয়তি কেন বাধ্যতে ? —তা আমি কি করে জানব বলুন !—নিশ্চয়ই এই সামনের চতুর্দশীতে ! [ দুইজন ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; জ্যোতিষী আড়ভাবে তাকাইয়া তাঁহাদিগকে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন।] —আচ্ছা মা, তখন কথা হবে ! আজ সন্ধ্যে ছটায়, ঠিক আছে ! হাঃ, হাঃ, হাঃ উচ্চহাসি ] খোকাবাবুর বিশ্বাস হয়েছে। বেশ, বেশ— ! আমরা ত বিধাতার হাতের পুতুল মাত্র ! আচ্ছা মা ?" কথাবার্তা শেষ হইল, যন্ত্রটা যথাস্থানে রাখিয়া জ্যোতিষী ঠিক হইয়া বসিলেন।

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ; অপরজন অবাঙ্গালী। উভয়েই জ্যোতিষীকে অভিবাদন করিলেন, বাঙ্গালী ভদ্রলোককে জ্যোতিষী বলিলেন, "অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা, কেমন

আছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি। আপনি আমার যা করেছেন, জীবনে সে ঋণ শোধ করতে পারব না।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "না, আমরা ত নিমিত্তমাত্র। সবই সেই মায়ের লীলা, ওই যে গ্রহমণ্ডলী ঊর্ধ্বে রয়েছে, তাঁরাই সব নিয়ন্ত্রণ করছে।"

বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিলেন, "সে কি কথা! এই যে বেঁচে আছি, তা আপনারই দয়ায়।"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "মায়ের দয়ায় গ্রহমণ্ডলী প্রসন্ন হয়েছে। আমি নিমিত্তমাত্র! তা না হলে তিনদিন জ্ঞান নেই, নাড়ী পাওয়া যায় না! এরোগী বাঁচে কি করে—!"

বাঙ্গালী ভদ্রলোক জ্যোতিষীর পদধূলি লইলেন। তিনি জ্যোতিষীকে বলিলেন, "আপনার নাম শুনে আমার এই বন্ধু অনেক আশা করে এসেছেন! বড় ব্যবসায়ী, নামকরা লোক। কিছুদিন হয় বড় খারাপ যাচ্ছে; তাঁর কোষ্ঠীখানা দেখতে হবে।"

অবাঙ্গালী ভদ্রলোক আধা হিন্দি আধা বাংলার খিঁচুড়িতে বলিলেন, "আপকা নাম বহুৎ শুনেছি; ঐ বাঙ্গালীবাবু আমার বিশেষ দোস্ত আছেন। উনিকো পাশ আপনার আশ্চর্য গণনা আউর দৈবশক্তির কথা শুনে প্রণাম জানাতে এসেছি।"

জ্যোতিষী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; তারপর বলিলেন, আচ্ছা, কোষ্ঠী দেখি! [ চক্ষু খুলিয়া হাত বাড়াইয়া কোষ্ঠীখানি লইলেন ] কোষ্ঠী-খানি খুলিয়া উহার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন, তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল; পাঁচ, দশ, পনের মিনিট কাটিয়া গেল। জ্যোতিষী কথা বলেন না, তাঁহার চোখে ধারা বহিতেছে। আগন্তুকেরা উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

অবাঙ্গালী ভদ্রলোক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজী, কি হয়েছে! আমি কি কোন কসুর করেছে?"

জ্যোতিষী—না, না, না, এ কোষ্ঠী আমি দেখব না, আমি কিছুই বলব না; ( কোষ্ঠীখানি দিতে গেলেন ) নিন্ আপনার কোষ্ঠী! হায় ভগবান্—জয় তারা!

বাঙ্গালী—[ অনুনয় ও মিনতি সহ জোড়হস্তে ] পণ্ডিতজী, ইনি আমার বিশেষ বন্ধুলোক! কোন বিপদ্ আপদ থাকলে বলুন,—কি করতে হবে?

অবাঙ্গালী—ইছি লিয়েত আপকা পাশ আয়া! পণ্ডিতজী, আমার জন্মপত্রিকায় যা আছে বলুন।

জ্যোতিষী—কি বলব? বুক ফেটে যায়! আপনার একটিমাত্র লেড়কা আছে?

অবাঙ্গালী—হাঁ, ঠিক আছে।

জ্যোতিষী—তার নাম—ক-ক-কু-কু—

অবাঙ্গালী—ঠিক আছে—কুসুমলাল।

জ্যোতিষী—ওমর বছর তেরো।

অবাঙ্গালী—হবে, জনমপত্রিকা সে ঠিক মালুম হবে।

জ্যোতিষী—তিন সপ্তাহ মধ্যে আপনি ম-ম--মধুপুর কিংবা মুসৌরী যাচ্ছেন; পাহাড়—পাহাড় ঠেকছে জায়গাটা!

অবাঙ্গালী ত তাজ্জব বলিয়া গেলেন! এইসব কথা এই অপরিচিত জ্যোতিষী কি করিয়া জানিল! কত পণ্ডিত জ্যোতিষী—মাড়োবার হইতে কলিকাতা—কাশী-হরিদ্বার—কোথাও এমন অন্তর্যামী জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ মিলে নাই! বিস্ময়-বিমূঢ় অবাঙ্গালী ব্যবসায় কৌশলে প্রচণ্ড কূটবুদ্ধি মাড়োবারবাসী ভদ্রলোক স্তম্ভিত! বাঙ্গালী ভদ্রলোক

ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন, উনি মধুপুর যাচ্ছেন।"

জ্যোতিষী—আর বলতে পারব না, মাপ করুন আমাকে। মা তারা! একি তোর ইচ্ছে মা? (জ্যোতিষী ফুঁপাইয়া উঠিলেন)

অবাঙ্গালী—কি হবে পণ্ডিতজী? [জ্যোতিষীর পায়ে হাত দিতে গেলেন]

জ্যোতিষী—[বাধা দিয়া] করেন কি? করেন কি?

অবাঙ্গালী—বলুন, আমার ছেলের কি কোন বিপদ্ আছে?

বাঙ্গালী—টাকার জন্য চিন্তা করবেন না পণ্ডিতজী!

অবাঙ্গালী—যদি কোন দোষ থাকে, আপনি তার প্রতিকার করুন।

জ্যোতিষী—কোন প্রতিকার থাকলে ত লেঠাই ছিল না। পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে শুক্লা ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় কুসুমলালকে বৃ-বৃ--বৃশ্চিক অর্থাৎ সর্প দংশন করবে। উঃ, উঃ, জয় মা তারা! আমার গুরুমন্ত্র কি ব্যর্থ হবে?

বাঙ্গালী—পণ্ডিতজী, আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে।

অবাঙ্গালী—যত রূপেয়া লাগে আমি দেবো—পাঁচশো,—সাতশো, হাজার, পাঁচ হাজার।

জ্যোতিষী—লাখ টাকায়ও তা সম্ভব নয়! অখণ্ডনীয় নিয়তি!—জয় মা তারা! সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

তারপর অনুরোধ ও উপরোধে মায়ের আদেশের জন্য জ্যোতিষী সময় লইলেন। * * * শুক্লা ত্রয়োদশী সম্ভবতঃ জ্যোতিষীর যাগযজ্ঞের মাহাত্ম্যে নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, এরকম জ্যোতিষী ভূ-ভারতে নাই! এ আপনার বানানো গল্প!

সত্যশরণবাবু মৃদুহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—'না মশাই, সত্যি গল্প; আমিই সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোক। এই অবাঙ্গালী ভদ্রলোকের সামান্য উপকার করিতে পারিয়া জ্যোতিষীর আশীর্বাদে সেবার সপরিবারে দিব্বি আরামে মধুপুরে কাটিয়ে এসেছি একমাস!

শ্রোতাটি উত্তেজিতভাবে বলিলেন, বুঝেছি, তাহলে আপনি জ্যোতিষীর দালাল!

# কালোছায়া

আমার কোন সহৃদয় বন্ধু একখানি 'স্তবকবচমালা' উপহার দিয়াছেন। বসুমতীর প্রশ্নোত্তরজালে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বিশ্রাম করিবার অবকাশ নাই। তাহার উপর আমার বাড়ীর ঠিকানা যোগাড় করিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বিতের দল প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন; সুতরাং স্নানাহার পর্যন্ত ঠিক সময় ঘটিয়া উঠে না। অন্যের ভাগ্যলিপি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে গিয়া নিজের ভাগ্যকেই বিড়ম্বিত করিয়া তুলি!

'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'—ভাগ্যবিড়ম্বনার নিষ্ঠুর পরিহাসের সম্মুখীন হইলে এই বাক্যটি আশা যোগায়! বিপন্ন মানুষ দৈবকে বিশ্বাস করে। যেখানে সাফল্যের কোন আশাই নাই, সেখানে দৈবই একমাত্র নির্ভর! সমস্তটা বৎসর লেখাপড়া অবহেলা করিয়াছে; সেই ছেলে পরীক্ষা দিতে চলিয়াছে; তাহার সঙ্গে লইয়াছে, কালীমাতার নির্মাল্য কিংবা সরস্বতী-কবচ! যাত্রাকালে গুরুজনের পদধূলি লইতে হয়; ইষ্টদেবতাকেও স্মরণ করিতে হয়!—দধির টিপ্, আঁশযুক্ত মাছ, শান্তিবচন—দৈবকে প্রসন্ন করিবার আরও কত প্রক্রিয়া রহিয়াছে। ভাল ছেলেদেরও এই সকল প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়; কি জানি কি হয়, দৈব মাথা ঘোলাইয়া দিতে পারে!

জ্যোতিষী ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের চমকপ্রদ কথা বলিতে পারে; ইহাও একটা দৈব ক্ষমতা! ভাগ্যবিড়ম্বিত হইলে মানুষ জ্যোতিষীর আশ্রয় লয়; তাহারা মনে করে, জ্যোতিষীর এমন কোন শক্তি আছে কিংবা এমন কোন উপায় বলিয়া দিতে পারে, যাহাতে দৈব প্রসন্ন হইবে! জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, গুরু, পীর, কিংবা ফকির দৈবেরই প্রতীক!

'স্তবকবচমালায়' দৈবকে প্রসন্ন করিবার উপায় খুঁজি ; সন্ধানও দেয় ; ধনদা-কবচে ধনলাভ, বংশলাখ্য কবচে সন্তানলাভ, বগলামুখী কবচে শত্রুদমন ও মোকদ্দমায় জয়লাভ, মহামৃত্যুঞ্জয় কবচে যমরাজকে কদলি-প্রদর্শন আরও কত কি ! দেখিয়া আশান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি ! মনে মনে ভাবি, এত উপায় থাকিতে আমরা এত অসহায় কেন ? দুঃখদারিদ্র্যে জর্জরিত হয় কেন এইগুলির আবিষ্কারক ঋষিসন্তান ব্রাহ্মণেরা ? স্তম্ভিত হওয়ারই কথা ! এইগুলি প্রয়োগের কথা চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া নিরাশ হই ! কারণ অধিকাংশ কবচই এমন এক একটি প্রক্রিয়ায় করিতে হয় যে, সেই প্রক্রিয়াগুলি বুঝিবার জন্য পুরোহিত-দর্পণ, ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি, তন্ত্রসার, নিত্যকর্মপদ্ধতি, শান্তিস্বস্ত্যয়ন-কল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য লইতে হয় ; নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুযায়ী দিনকে সুগম ও সাফল্যপূর্ণ করিবার জন্য যে সকল প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা পালন করিতে গেলে আর কোন কাজকর্ম করার অবকাশই থাকে না ! আশ্চর্য ব্যবস্থা ! তাহার উপর সোওয়া লক্ষ কিংবা দেড় লক্ষ জপ করিয়া পুরশ্চরণাদি দুষ্কর প্রক্রিয়ায় কবচাদি প্রস্তুত করা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব !

তথাপি স্তবকবচমালার স্তোত্রগুলির প্রতি একটা বিশেষ মোহ জন্মিয়া যায় ; কি জানি, কি একটা আকর্ষণে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর স্তবপাঠ করি ।

কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপররহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং
বীজং তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধু ত্রিকৃতং যে জপন্তি ।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ
স্বচ্ছন্দং ধবান্তধারাধররুচি-রুচিরে সর্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥”

এই স্তোত্র পাঠই একদিন আমাকে বিপন্ন করিল ; শ্রাবণের সন্ধ্যা টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে । মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ

চমকাইতেছে; রিক্সাওয়ালার ঘণ্টা ঠং ঠং করিয়া বাজিতেছে; তার উপর বাস ও ট্রামের বিকট আওয়াজ মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। বন্ধুবান্ধবেরা কিংবা ভাগ্যবিড়ম্বিতের দল এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই আজ আসিবেন না ভাবিয়া 'স্তবকবচমালা' হাতে লইলাম। শ্রীশ্রীকালীর স্তোত্র পাঠ করিতেছি; স্তোত্রটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় মনে হইল ঘরের মধ্যে কাহারা যেন প্রবেশ করিল। আমি আপন মনে পড়িয়াই চলিলাম। স্তোত্রটি শেষ করিয়া দাঁড়াইলাম, এমন সময়ে আগন্তুকদের মধ্যে একজন মহিলা অকস্মাৎ আমার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

আমি তাঁহার এইরূপ আচরণে স্তম্ভিত হইলাম! "একি! একি! আপনি কে? কেন এমন করছেন? পা ছাড়ুন, কি হয়েছে, বলুন।"

মহিলাটি চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে মাথা তুলিলেন; কিন্তু আমার পা ছাড়িলেন না। আর্দ্রস্বরে তিনি বলিলেন, "আগে আমাকে কথা দিন, আমার কথা রাখবেন বলুন!"

আমি বলিলাম, "আপনি একি করছেন? আগে আপনার কথাটাই শুনি! আমায় কি করতে হবে?"

মহিলাটি বলিলেন, "আপনি না বাঁচালে, আর কোন উপায় নেই। এমন কিছুই নয়, আগে আপনি বলুন—আমাদের কথা রাখবেন।"

মহিলাটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা; বসনভূষণ ও রূপলাবণ্যে বড় ঘরের বধূ বলিয়াই মনে হইল; ইতিমধ্যে দরজার পাশ হইতে একজন প্রিয়দর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তিনি বিশেষ বিনীতভাবেই বলিলেন, "বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি, আমাদের এ বিপদ্ থেকে বাঁচাতেই হবে।"

আমি বলিলাম, "আমার মত সাধারণ মানুষ আপনাদের কি উপকার করতে পারে, বুঝি না! কোষ্ঠী ঠিকুজি দেখলে দু-এক কথা বলতে পারি, এ ছাড়া ত কিছুই নয়!"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমরা আপনার ক্ষমতার কথা জানি, তাই ত এই দুর্যোগের মাঝে আপনার কাছে ছুটে এসেছি!"

আমি ত বিস্ময়ে হতবাক্! নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে কৌতূহলজনক সন্দেহ হইল, সবই দৈবের খেলা। হঠাৎ মনে পড়িল, লোকে জ্যোতিষীদের দৈব-পরিচালক মনে করে! সম্ভবতঃ ইহারাও সেই দলেরই। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আচ্ছা, আগে ব্যাপারটা শুনি, তারপর ব্যবস্থা করব, আগে আমার পা ছাড়ুন।"

মহিলাটি আমার পা ছাড়িলেন বটে, কিন্তু প্রণত ভঙ্গীতেই বলিলেন, "আমার ভাইকে বাঁচান, সে আত্মহত্যা করবে; সকাল থেকে দরজা বন্ধ করে রয়েছে।" মহিলাটি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, "কেন সে আত্মহত্যা করবে? দরজা খুলে তাঁকে বুঝান, না বুঝলে বেঁধে রাখুন, না হয় পুলিশে খবর দিন।"

"না, না, সে হয় না। আমার একটি মাত্র ভাই, বছর খানেক হয় সবেমাত্র বিয়ে করেছে! আমার ভাইয়ের মতিগতি ফিরিয়ে দিন।" মহিলাটির আচরণ ও আবেদন আমাকে বিচলিত করিলেও ইহাদের হাত হইতে মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিলাম।

"আমার বুড়ো মা; এসব দেখে শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন! বারবার তাঁর ফিট হচ্ছে! আপনি একটা উপায় করুন।" মহিলাটি ছাড়িবার পাত্রী নহেন।

আমি বলিলাম, "দেখুন, মিছামিছি আপনারা আমাকে ধরেছেন! জ্যোতিষ চর্চা করি; পত্রিকায়ও লেখি! কিন্তু কোনরূপ দৈবশক্তি আমার নেই; এরূপ কোন মন্ত্রতন্ত্রও আমি জানিনে।"

আমার কথা শুনিয়া মহিলাটি আবার পা জড়াইয়া ধরিলেন: 'আমাদের বাঁচান, আর কোন উপায় নেই।'

'আপনারা না পারেন, পাড়া-প্রতিবাসী বন্ধু-বান্ধবদের বলুন, জোর করে দরজা খুলে ফেলুন; ছেলেটি বিয়ে করেছে বললেন; ওর স্ত্রী কোথায়?"—আমি তাঁহাদের সাহস দিয়া বলিলাম।

মহিলাটি তবুও ছাড়েন না; তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বউ বাপের বাড়ী গেছে; সে কি করবে? আর পাড়া-প্রতিবাসীদের ডাকব? তাহলে যে আমাদের মানসম্ভ্রম নষ্ট হবে।"

ভাবিতে লাগিলাম; কি জানি কি হইয়া গেল! অকস্মাৎ মহিলাটির মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত ঠেকাইয়া বলিলাম, "ওঠ মা, তোমার ভাই আত্মহত্যা করবে না; এটা তার একটা ছলনামাত্র।"

মহিলাটি আকস্মিক একটা শক্তি লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আমিও কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। কথাবার্তায় বুঝিলাম, সঙ্গী ভদ্রলোকটি এই মহিলার স্বামী। মহিলাটির গুণধর ভাইয়ের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে; যথেচ্ছভাবে টাকা পয়সা খরচ করে; মাঝে মাঝে মাকে এইরূপ ভয়ও দেখায়। কিন্তু এইবার চরমে উঠিয়াছে; যে আপিসে চাকুরী করে সেখানে টাকার গোলমাল করিয়াছে। সুতরাং টাকা সংগ্রহ না করিলে নিস্তার নাই। ভগিনীর বিশ্বাস এইবার প্রাণঘাতী বিষ সংগ্রহ করিয়াছে; ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করিয়াও ফেলিতে পারে!

মহিলাটি আমার অনেক লেখা পড়িয়াছেন। বসুমতীর রাশি-চক্রের উত্তরমালা নাকি আমার দৈবশক্তির পরিচয় দেয়! তাঁহার ধারণা আমি তাঁহার ভাইয়ের মতিগতি ফিরাইতে পারিব! 'একটা কিছু তাঁকে দিতে হবে।'—তর্ক বিতর্কে কোন লাভ নাই ভাবিয়া

আমার ঘরের ঠাকুরের নির্মাল্য হইতে খানিকটা একটা কাগজের মোড়কে দিয়া বলিলাম,—"এই জিনিসটা ভাইয়ের বালিশের তলায় রেখে দেবেন।"

মহিলাটি বলিলেন, "সে যদি দোর না খুলে, তাহলে কি হবে?"

সমস্যা বটে! আগে এত ভাবি নাই। বলিলাম, তাহলে দরজার সামনেই রেখে দেবেন।

মহিলাটি আবার প্রশ্ন করিলেন, 'সে আজ সকাল থেকে কিছুই খায়নি, তার কি হবে?'

উত্যক্তবোধ করিয়া অভিভূতের মত বলিলাম, "এতেই কাজ হবে; দরজাও খুলবে; খাবারও খাবে।"

পরম আশ্বস্ত হইয়া স্বামী-স্ত্রী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীকালীমাতাকে প্রণতি জানাইলাম। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমার শরীর যেন কালঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

মাঝে একটা দিন কাটিয়া গেল; তৃতীয় দিনে ঠিক একই সময়ে এইরূপ কালী স্তোত্র পাঠ করিতেছি।

"ওঁ আদ্যাং সর্বতেজোময়ীং শ্যামাং করালবদনাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজা বিশাল-ত্রিনেত্রাং স্মেরানন-সরোরুহাং খড়্গদক্ষিণোর্দ্ধ পাণিকাম্......

সেই মহিলাটি ঘরে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে তাঁহার স্বামী ত আছেনই, তাহা ছাড়া একজন বৃদ্ধা মহিলাও আছেন। এইবার দুইজনেই আমার পায়ে হাত দিতে আসিলেন; কিন্তু আমি কিছুতেই তাহা করিতে দিলাম না। বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন। মহিলাটি বলিলেন, "এবার মাকে নিয়ে এসেছি; আপনার দয়ায় কাজ হয়েছে; কিন্তু একটা উৎপাত বেড়েছে। তাই বড় ভয়!"

আমি বলিলাম; "কাজ হয়েছে ভালই; কিন্তু মিছামিছি মাকে এই বুড়ো বয়েসে কষ্ট দেওয়া কেন? উৎপাতটা কি শুনি।"

মহিলাটি বলিলেন, 'সেদিন থেকে একটা কালোছায়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ; সে তো ভয়েই অস্থির।"

হাসিয়া বলিলাম, 'এ কিছুই নয়! ছেলেটি মিছামিছি একটা ভান করছে।'

মহিলাটির স্বামী বলিলেন, "না, ভান নয়, সত্যি বলে মনে হচ্ছে!'

মহিলাটি বলিলেন, 'সেদিন রাত্রে আপনার এখান থেকে ফিরে গিয়ে কত সাধাসাধি করা গেল ; কিছুতেই দোর খুললে না। আপনার দেওয়া কাগজের মোড়কটি শেষে দোরের সামনেই রেখে দিলুম, সারারাত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি ; কারো চোখে ঘুম নেই ; রাত তখন চারটা হবে ; হঠাৎ সুনীল ( ভাইটির নাম ) দোর খুললে ; আমরা দোরের সামনেই মাদুর পেতে শুয়েছিলুম ; দোর খোলার শব্দ শুনেই মা হকচকিয়ে উঠলেন ; খোকন দরজা খুলেই মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'মা আমার বড্ড ভয় করছে ; ঐ যে, ঐ যে —কালোছায়া!'

মহিলাটি বলিতে লাগিলেন, 'আমরা ত কিছুই দেখতে পেলুম না ; ভাইটি ভয়ে শিউরে উঠল ; বলতে লাগল, 'কাল সন্ধ্যায় তোমরা কোথা গেছলে? সেখান থেকে তোমরা ফিরে আসার পরই আমার ঘরে যেন একটা কালো ছায়া-মূর্তি ঘুরে বেড়াতে লাগল ; চোখ বুঁজেও রক্ষা নেই ; সে যেন গা ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে।'

এইবার ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমিও প্রথম মনে করেছিলুম, এও একটা চালাকিমাত্র? কিন্তু তার কাণ্ডকারখানা আর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে সত্যি আমারও ভয় হল। তার মনে সাহস দেবার জন্য বললুম, ও কিছুই নয় ; সারাদিন খাওনি, ঘুমোওনি ; মাথায় জল দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথায় জল দেওয়া হ'ল ; কিন্তু তবুও বলে—ঐ যে ঐ যে!'

আমার কৌতূহল বাড়িল ; ছেলেটি আচ্ছা ফন্দি জানে ! বলিলাম, "তারপর এতক্ষণে সব ঠিক হয়ে গেছে নিশ্চয় !"

"কতকটা শান্ত হয়েছে বটে ; কিন্তু কালোছায়া কিছুতেই ওর সঙ্গ ছাড়ছে না ; সে তো ভয়ে অস্থির ; কিছুতেই একা থাকতে চায় না ! কাল সারারাত আলো জ্বেলে জেগে থাকতে হয়েছে। আমরাও ভয় পেয়ে গেছি।"—ভদ্রলোক অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি এর একটা বিহিত করুন !"

তাঁহার কথা শুনিয়া এইবার আমি ঘাবড়াইয়া গেলাম। এই 'কালোছায়া' আর 'কালীস্তোত্র' আমাকে বিপদে ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হইল ! মনে মনে কালীমায়ের দুলাল ঠাকুর-শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করিলাম।

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, "সে একা থাকতে পারে না ; মাঝে মাঝে ভয়ে শিউরে উঠে ; আর ঐ যে, ঐ যে, ঐ এসেছে বলে দুহাতে চোখ মুখ ঢেকে কাঁপতে থাকে।"

ভাবিলাম, ছেলেটি সম্ভবতঃ তাহার পরিজনকে এই রকম ভয় দেখাইতেছে ; নিশ্চয়ই তাহার কোন কুমতলব আছে ! আমি যখন এইরূপ ভাবিতেছি, তখন লক্ষ্য করিলাম, বাহিরে একটি যুবক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এইবার বৃদ্ধা মাতা করুণ স্বরে বলিলেন, "বাবা, আমার খোকনও সঙ্গে এসেছে ; ভয়ে ঘরে আসছে না। তার অপরাধ হয়েছে ; তুমি ওকে মাপ না করলে ঐ কালোছায়া ওকে ছাড়বে না।"

বৃদ্ধা উঠিয়া দরজার গোড়ায় গিয়া ডাকিলেন, "খোকন, আয় ঠাকুরমশায়ের পায়ে ধরে মাপ চা।"

এইরূপ কথা শুনিয়া আমি আরও স্তম্ভিত হইলাম ; এই রকমের ভৌতিক কাণ্ড আমার কল্পনারও বাহিরে। মনে মনে আমি নিজেই

কালোছায়ার ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম! যাহাই হউক না কেন, ইহারা আমাকে বেশ ঝঞ্ঝাটেই ফেলিয়াছেন। ইহাদের হাত হইতে আগে মুক্ত হওয়া দরকার। যুবকটি সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পায়ে হাত দিতে গেল ; তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'না ভাই, তুমি মা কালীর কাছেই ক্ষমা চাও ; আমাকে অপরাধী করোনা ; মা কালীর ছায়াই তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আর কক্ষনো মায়ের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করবে না—প্রতিজ্ঞা কর।"

ছেলেটি আমার বাধা মানিল না ; আমার পায়ে মাথা রাখিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিল, "না, না, আমি আর কক্ষনো মায়ের মনে ব্যথা দেবো না ; আপনি আমায় মাপ করুন !"

মনে হইল ; কালোছায়ার ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। ছেলেটি সত্যই ভয় পাইয়াছে। তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, "ভয় নেই ; মাকে প্রণাম কর ! কাল দক্ষিণেশ্বরে পূজা দিয়ে আসবে ; আর কোন ভয় নেই।"

তাহারা বিদায় লইলেন ; আমিও কালোছায়ার কথা ভাবিতে লাগিলাম ; ভয়ও হইল। এইবার হয়ত আমারই পালা !

কিছুই হয় নাই বটে ; কিন্তু ঘটনাটি শুনিয়া আমার এক তান্ত্রিক বন্ধু বলিলেন, "দীক্ষিত না হয়ে এরূপ মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করোনা ; কোনদিন বিপদে পড়বে।"

তাঁহার সাবধান বাণী সত্ত্বেও 'কালীস্তোত্র' পাঠ ছাড়ি নাই. কালোছায়ার সমাধানও এই-পর্যন্ত করিতে পারি নাই।

# ঘরোয়া পাঁচালী

## এক

'পথের পাঁচালী' নয়; আমাদের পারিবারিক জীবনের বিচিত্র পাঁচালী; কল্পনা নয়, সত্য ও বাস্তব সমস্যা! জ্যোতিষী একাধারে তাহার বিচারক ও সমস্যা-পূরক। প্রতিকার চাই, পারিবারিক শান্তি স্থাপনে জ্যোতিষীর মন্ত্রতন্ত্র, কবচমাতুলি অব্যর্থ কিনা!

"আমার স্ত্রীর দ্বারা আমার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে; জিনিস ও নগদ টাকায় মোটমাট তিন হাজার টাকা হইবেক। আমাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে। আমি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ; মেয়ের বিবাহ দিব বলিয়া জিনিস ও টাকা যোগাড় করিয়া পাত্র দেখিতে-ছিলাম। এই ঘটনার সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। আমার ভগ্নী কোন প্রকারে খবর পাইয়া আমাকে গোপনে জানায়, তবে আমি জানিতে পারিলাম। এমন কি নিজের গায়ের গয়না পর্যন্ত বাঁধা দিয়া সর্বস্ব হরণ করিয়াছে। আমি একেবারে পাগলের মত হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা কোথায়? তাহার উত্তরে বলে, সংসারে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পর অনেক পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেছে— টাকা আছে, নষ্ট হয় নাই। কিন্তু টাকা আজ পর্যন্ত বাহির করিতেছে না। গত বৎসর ভাদ্র মাসে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি জানিতে চাই, টাকা কাহাকেও ধার দিয়াছে, না, কোন জায়গায় সরাইয়া দিয়াছে? দয়া করিয়া আমাকে বাঁচান। আমি বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ।..."

চিঠি লিখিয়া সেই বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ আমারই নিকট সশরীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার কি করিতে পারি? ভয় দেখানো, পীড়াপীড়ি, মারামারি কাকুতি-মিনতি, প্রলোভন ও প্রেম-প্রীতি সবই

যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনই সর্বস্বান্ত স্বামী জ্যোতিষীর দরবারে হাজির হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার শালাটালা আছে ত ?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আছে ; কেন বলুন ত ?"

আমি উত্তর দিলাম, "টাকা আপনার যায় নি ! শ্বশুরবাড়ীতে খবর করে দেখুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সেখানে কোথায় দেখব ? তাঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ! একটি শালা অবশ্য চাকরি বাকরি করে না। মাস কয়েক হ'ল, একটা রেশনের দোকান করেছে।"

হাসিয়া বলিলাম, "টাকা নিশ্চয়ই আছে ; দিদির টাকায়ই ছোট ভাই দোকানটা করেছে !"

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমারও একবার এরকম সন্দেহ হয়েছিল ; কিন্তু ওযে কিছুই স্বীকার করে না।"

আমি বলিলাম, "স্বীকার করলেই বিপদ্ ! যদি ভাই টাকাটা না দেয় ?"

ব্রাহ্মণ শঙ্কিত হইলেন ; রামদুলালকে টাকা দিয়েছে ! সে যা' ষণ্ডামার্ক ছেলে ! আমাকে ত কেয়ারই করে না। এখন কি হবে বলুন !"

আমি বলিলাম, "রেশনের দোকানে বেশ দু'পয়সা লাভ হয় ; বাঁধাধরা খদ্দের ; মাল গভর্ণমেণ্টই দেয় ! একটু বুদ্ধি করে চালাতে পারলে বছর-খানেকের মধ্যেই টাকাটা ঘুরে আসবে। নিশ্চয়ই ভাইটি দিদিকে লাভেরও কিছু অংশ দেবে !"

ব্রাহ্মণ এইবার বলিলেন, "রামদুলালটা যা চামার ! হাড়-কিপটে ! তার লাভ হবেই !" এদ্দিনে আমার পয়সায়ই তাহলে পোদ্দারি হচ্ছে !" তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলাম, "সাবধান, ওকথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না; বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বলুন, রামদুলালের মতলব ভাল নয়; তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রামদুলালকে যে সে-ই টাকা দিয়েছে, তার প্রমাণ কি?"

আমি বলিলাম, 'মশাই, কুড়ি বছর ধরে ঘর করছেন, নিজের স্ত্রীকেও বুঝতে পারলেন না! নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'না, না, নিশ্চয়ই নেই!'

তিনি যেন আবেগে গদগদ হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, "তাহলেই বুঝুন, টাকাটা গেল কোথায়? রামদুলালের দোকানের গোড়ায় ঐ টাকাটাই রয়েছে। যখনই দরকার পড়বে, পাবেন। আচ্ছা আপনার শাশুড়ী বেঁচে আছেন ত?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হ্যাঁ, আছেন।"

আমি ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, "মেয়ের বিয়ে সাব্যস্ত করুন; টাকার ভাবনা করবেন না। রামদুলালই টাকা দেবে!"

ব্রাহ্মণ সন্দেহাকুল মনে চলিয়া গেলেন; মাসখানেকের মধ্যেই তাঁহার মেয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র আসিল! চিঠির এক কোণায় লেখা ছিল—আপনার কথাই সত্য রামদুলালই টাকা দিয়েছে।

দুই

শিক্ষিত ভদ্রলোক; বেশ বড় চাকুরী করেন। বাড়ীতে স্ত্রী, মা, আর ছেলেমেয়ে। তবুও শান্তি নাই; অল্প বয়সেই ভদ্রলোকের চুল পাকিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে আসিয়া কোষ্ঠী দেখান; ভাল লাগে

তাঁহার আলাপ-আচরণ। কিন্তু তাঁহার মুখখানি সর্বদাই বিষাদ-মলিন ; মুখের হাসিও বিষাদ-পূর্ণ! যে কয়েকদিন আসিয়াছেন, কি প্রশ্ন যেন ঠোঁটের কাছে আসিয়া আটকাইয়া যায়! আমারও সন্দেহ হয়, কিন্তু কিছুই বলিতে পারি না!

তারপর আর একদিন! চুলগুলি রুক্ষ ; যেন স্নান আহারও করেন নাই ; দশটায় আসিলেন, এটাসেটা প্রশ্ন করেন ; এগারটা বাজিল ; বলি-বলি করিয়াও কি যেন বলিতে পারিতেছেন না! কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম, 'আপনার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বলে ফেলুন ; আমার অন্য কাজ আছে।'

তিনি বলিলেন, 'আমি বড় বিপন্ন হয়ে পড়েছি। অথচ বিষয়টা আপনাকে বলতেও পারছি না।'

আমি উত্তর দিলাম, 'না বললে আমি কি করে বুঝব? আপনার আপিসে কি কোন গোলমাল হয়েছে! চাকুরীর কি কোন—।'

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, 'আপিসে কিছুই হয়নি। আমার স্ত্রীকে নিয়েই বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি।'

আমি বলিলাম, "কেন, তাঁর আবার কি হয়েছে!"

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমার মাথামুণ্ডু হয়েছে! পাগল মশাই, আস্ত পাগল! আমাকে বছর তিনেক ধরে অস্থির করে তুলেছে ঃ দেখতে পারে না ; মাঝে মাঝে ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "নিশ্চয়ই মনোবিকার ঘটেছে ; কোন ডাক্তার দেখান!"

তিনি বলিলেন, "মনোবিকার নিশ্চয়ই! কিন্তু ডাক্তার দেখাবার উপায় নেই ; ডাক্তারের নাম শুনলেই ক্ষেপে যায়!"

আমি বলিলাম, ছেলেমেয়েদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন?"

তিনি বলিলেন, "বেশ ভালই! আমার মাও তার সেবায় খুশী।

আমিই যত গোল করেছি। আপিস থেকে ফিরলেই বলবে, ছিঃ, ছিঃ, মদ খেয়ে এসেছে! মদের গন্ধ বেরুচ্ছে! তারপর কাপড়-জামা ছাড়লেই ডেটলের জল ঢেলে দেয়।"

আমি বলিলাম, "বেশ, আপিস থেকে এসে আর কাপড়চোপড় না ছেড়েই বেরিয়ে পড়বেন।"

তিনি বলিলেন, "তা হ'লে ত রক্ষেই থাকবে না; গায়েই জল ঢেলে দেবে! এখন আমি অনেক রাত ক'রে বাড়ী ফিরি; তখন ঘুমিয়ে পড়ে; পরদিন সকালে কিছু ঠাণ্ডা থাকে। আপিস থেকে ফিরলেই যত গণ্ডগোল। কাল রাত্রে হঠাৎ আমার শব্দ পেয়ে জেগে উঠেই বিছানায় ডেটলের জল ঢেলে দিয়েছে! সারারাত ঘুমুতে পারিনি! এটা কি রকমের বাতিক, বুঝতেই পারছি নে।"

ভদ্রলোকের অবস্থা চিন্তা করিয়া মনে করুণারই উদ্রেক হইল; সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "জ্যোতিষ মতে বিরূপ গ্রহের নির্দেশই আমি দিতে পারি; এর বেশী আমার আর করবার কি আছে? আপনি সময় থাকতে কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তারের পরামর্শ নিন?"

তিনি বলিলেন, "কেন এ রকম হবে? আমাদের ত কেউ ধরে-বেঁধে বিয়ে দেয়নি। অনেকদিন থেকেই আমরা বুঝাপড়া করেই বিয়ে করেছি : আমার স্ত্রীও একজন এম-এ।"

আমি বলিলাম, 'তাতে কিছু যায় আসে না; আমার মনে হয়, কোনরূপ ভুলবুঝা কিংবা সন্দেহ থেকেই এরূপ মনোবিকার হয়েছে : আপনার স্ত্রীর জন্মকুণ্ডলীতে শনি ও চন্দ্রের যোগ দেখা যাচ্ছে।'

তিনি বলিলেন, "আপনি রাজযোটক বিশ্বাস করেন? আমাদের অবশ্যি যোটক-বিচার করে বিয়ে হয় নি; কিন্তু দেখুন ত, তৃতীয়-একাদশে রাজযোটকই হয়েছে! তা হলে এ গরমিল কেন?"

আমি বলিলাম, "শুধু রাজযোটক দেখলে চলবে না; উভয়ের দোষগুণের সামঞ্জস্য হয়েছে কি না, দেখতে হবে।"

তিনি বলিলেন, "দেখুন, ডাক্তার দেখাতে আমার ইচ্ছা একদম নেই; আমাদের পারিবারিক ব্যাপার ডাক্তার অন্যভাবে নিতে পারে! বিশেষ ক'রে আমার স্ত্রী যখন আমারই নামে যা খুশী বলতে থাকবে। তাতে বন্ধুদের কাছে আমার মাথা হেঁট হবে।"

"ডাক্তার নিশ্চয়ই আপনার বন্ধু নন্। আর পাগল যা খুশী বলবে, তার উপর কি কেউ বিশ্বাস করে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করবে?"— আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম।

ভদ্রলোক ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন, "দেখুন কোনরূপ সন্দেহ থেকেই যখন এর উৎপত্তি, তখন ডাক্তার তার কি প্রতিকার করবে? ওষুধ খাওয়ালে বা ইনজেকশন দিলে ত এ অসুখ সারবে না।"

ভদ্রলোককে বলিলাম, "তাহলে কয়েক মাস আপিস থেকে ছুটী নিয়ে দুজনে ঘনিষ্টভাবে একসঙ্গে থাকতে পারলেই এ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে; না হয়, দুজনে কোথাও চেঞ্জে চলে যান।"

ভদ্রলোক ম্লান হাসিতে উত্তর দিলেন, "তাও দেখেছি: কিছুটা কাজ হয় বটে; কিন্তু আবার ওর কোন সমবয়স্কা মেয়ে দেখলেই মাথা বিগড়ে উঠে: ধারণা মেয়েরা আমার প্রেমে পড়বার জন্য ওত পেতে রয়েছে! আর আমি নির্বিচারে তাদের প্রেমে পড়ছি।"

আমিও রসিকতা করিয়া বলিলাম: 'তা হলে নারীহীন রাজ্যের সন্ধান দেখুন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "দেখ্তেই হবে; কিন্তু এখন বলুন, এর কোন প্রতিকার আছে কি না? এক তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে ত হাজার দেড়েক টাকা জলে গেছে! আপনি শিক্ষিত লোক; বন্ধু বলতে পারি! একটা উপায় করে দিন।"

আমি বলিলাম, "ফল হবে কি না জানিনে; শনি-চন্দ্রের প্রতিকার রক্তমুখী নীলা!"

রক্তমুখী নীলার নাম শুনেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বলেন কি রক্তমুখী নীলা পরাব! আমাদের ওই জবরদস্ত কানুদাস পর্যন্ত রক্তমুখী নীলা ধারণ করে শেষে বাপ্ বাপ্ বলে ছেড়ে দিয়ে বাঁচে।"

জানি, রক্তমুখী-নীলা সম্বন্ধে নানা আজগুবি কাহিনী শুনা যায়! রাম সান্ন্যাল মহাশয় নাকি রক্তমুখী-নীলা ধারণ করিয়া রেসের খেলায় একদিনে এক লাখ টাকা পেয়ে যান! আর বিভূতি মল্লিক নাকি রক্তমুখী-নীলা ধারণ করিয়া রক্ত বমি করিতে করিতে মারা যায়!

ভদ্রলোক বলিলেন, "কানুদাসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন! কি ষণ্ডামার্ক চেহারা ছিল তাঁর যৌবনে। প্রতিবেশী এক বুড়োর বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল: কানুদাস একা একটা লাঠি নিয়ে দু'জন ডাকাতকে ঠেঙ্গিয়ে সাবাড় করে দিয়েছিল; সেই বুড়ো নাকি খুশী হয়ে তাঁর পৈতৃক আমলের এক মহামূল্য নীলা কানুদাসকে উপহার দেয়! সেই নীলাই বিপদ্ ঘটালে! নীলা পরে ট্রামে উঠেই ট্রাম কণ্ডাক্টারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি আর তারপর রক্তারক্তি।"

আমি বলিলাম, "তারপর নিশ্চয়ই পুলিশ এসে হাতকড়ি পরাল।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "না, কানুদাস বড় শক্ত ছেলে! লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমেই চলন্ত বাসে চাপল; কিছুদূর যেতে না যেতেই সেই বাস একখানা ট্রামের উপর হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল। সব চূরমার! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে: কানুদাসকে আর পায় কে? ছুট, ছুট, ছুট—বাদুড়বাগানের মেসে ফিরে এসে কাঁপতে লাগল! হাতে সেই রক্তমুখী-নীলা! হঠাৎ একজনের চোখ পড়ল নীলার উপর! একি রে, নীলা পরেছিস্ সর্বনাশ! তারপর অন্ধকারে সার্কুলার রোডে গর্ত ক'রে নীলার সমাধি দেওয়া হল।"

অদ্ভুত গল্প! যাহাই হউক না কেন, ভদ্রলোকটিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম, "মিছেমিছি নীলা পরলে অনিষ্ট হতে পারে! আপনার স্ত্রী ত শখ করে নীলা ধারণ করছেন না; তাঁর বিরূপ গ্রহ শনি-চন্দ্র। তার জন্যই এটা দরকার।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাবে, এছাড়া কি কোন প্রতিকার নেই!"

আমি উত্তর দিলাম, "অনেক কিছুই আছে; আগেই বলেছি, ফল হবে কি না জানিনে। আগের দিন শাঁখে জল পুরে রেখে পরদিন মাথায় সে জল দিলেও উপকার পাবেন।"

ভদ্রলোক যেন কৃতার্থ হইলেন; 'এটা খুব সহজ, অবশ্য শাঁখের জলটা মাথায় ঢালবে কে? মাকে খুব ভক্তি করে! দেখি, মা কি বলেন?" নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে সিনেমা দেখিতে গিয়াছি; হঠাৎ সেই ভদ্র-লোকের সঙ্গে দেখা! তিনি সস্ত্রীক সিনেমা দেখিতে আসিয়াছেন; একবার নিরিবিলিতে আমাকে বলিলেন, "আপনার প্রক্রিয়ায় কাজ হয়েছে! কিন্তু বড় জ্বালা! আমাকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই সিনেমা দেখতে হয়; বাচবিচার নেই; প্রাণটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! আর একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব।

তিন

'তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ভালবাসে কি না'—এই ছিল তাঁহার প্রশ্ন? ভদ্রলোককে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বলিয়াই মনে হইল। এই জাতীয় প্রশ্ন বড় জটিল! সত্য কথা বলিলেও রক্ষা নাই। সব দিক বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়!

জন্মকুণ্ডলী নাড়াচাড়া করিয়া বলিলাম, "এরূপ মনে করবার হেতু কি! ঝগড়াঝাঁটি সব সংসারেই হয়ে থাকে! আর ভালবাসা বলতে কি বুঝাতে চান? ছেলেমেয়েদের আমরা কত মারধোর করি, তা বলে কি তাদের ভালবাসিনে?"

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে রকম ভালবাসার কথা হচ্ছে না, সত্যিই আমাদের মধ্যে আন্তরিক মিল আছে কি না?"

আমি বলিলাম, "এটাও আপনিই ভাল বুঝেন; আপনার দিক্ থেকে বিচার করে দেখুন।"

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন, "আমার মনে সন্দেহ জেগেছে বলেই ত আপনার কাছে এসেছি: আমার দিক থেকে ঠিকই আছে; কিন্তু আমার স্ত্রীর ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিনে?"

আমি বলিলাম, "বল্লেন ত আট বছর হইল বিয়ে হয়েছে; ছেলেপুলে হয় নি: তিনিও কোথায় চাকরি করেন!"

তিনি বলিলেন, "এই চাকরিই আমার কাল হয়েছে! আমি বের হই ৯টার সময়; আর তিনি বের হন, ১০।।০ সাড়ে দশটায়; আগে বেশ চলেছিল; ইদানীং তাই নিয়েই খটাখটি লেগে যায়! কে কাকে দেখে! ছেলেপুলে নেই! ত্নটি প্রাণীর বেশ চলে যায়। তাঁর চাকরি না করলেও চলে।"

আমি বলিলাম, "ছেলেপুলে নেই; হতেও ত পারে!" তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন, "তার ত কোন লক্ষণ দেখি না! তাঁর মাইনেও বেড়ে যাচ্ছে বেশ! এদিকে আমি বেচারী বাড়ী ফিরে একটু আরাম পাব, তারও উপায় নেই! তিনি ফিরেন ত্নচারজন বন্ধু নিয়ে!"

"কি রকম বন্ধু? তাতে আপনার কি আপত্তি থাকতে পারে?"—আমি কৌতুকবোধ করিয়াই প্রশ্ন করিলাম।

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন, "বন্ধু না ছাই, যত সব ধাড়ী মেয়ে!

বিয়ে হয়নি ; চাকুরি করে ঘুরে বেড়ায় ! মুখে কিছুই আটকায় না ; যত সব ইয়ার্কি, ঠাট্টা !”

আমি বলিলাম, ‘ওদের সঙ্গে ত আপনার কোন সম্পর্ক নেই !’

তিনি বলিলেন, ‘নেই বটে ; ওঁদের সংশ্রবে থেকে উনিও ওই রকম হয়ে উঠছেন কি না ! আগের মত আর সেই টানও নেই।’

আমি ভদ্রলোকের ক্ষোভের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, “বেশ, ওঁদের নিষেধ করে দেবেন।”

তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “আমি নিষেধ করবার কে ? আমি যেন কেউ নই ; কোন কোন দিন আবার দল বেঁধে বায়স্কোপে চলে যায় ! আমি ঘরে বসে ছটফট করি।”

“দেখুন দত্তমশাই, ছেলেপুলে নেই ; বয়েসও হয়েছে ! হৈ-হুল্লোড় করে তিনি বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাতে ক্ষোভের কোন কারণ ত আমি দেখিনে। আপনার পত্নীভাগ্য ভাল ; সপ্তমে বৃহস্পতি রয়েছে কি না ?”—আমার কথা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল না।

আমি আবার বলিলাম, “আপনার কি বন্ধুবান্ধব নেই ? আপনিও ওই রকম হৈ-হুল্লোড় সুরু করে দিন্! বিকালবেলা আপিস-ফেরতা কয়েকজন বন্ধুকে বাড়ী নিয়ে আসবেন ; দেখবেন, একদিনে সব টিট হয়ে যাবে।”

আরে মশাই, আমরা ব্যাটা ছেলে ! বয়েস হয়েছে। সকলেরই সংসারধর্ম আছে ! আপিস-ফেরতা সব আমার বাড়ী আড্ডা মারতে আসবে ?”—তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়া বলিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, এক আধদিন দু’চারজন বন্ধুকে ধরে নিয়ে আসবেন। তাতেই কাজ হবে।”

তিনি বলিলেন, “আপনি আমার আসল প্রশ্নই এড়িয়ে গেছেন !”

আমি বলিলাম, “তার উত্তর দিয়েছি। ছেলেপুলে নেই ; বয়েস

হয়েছে। একটা কিছু অবলম্বন করে ত থাকতে হবে। এ আর কিছুই নয়; ভালবাসা ঠিকই আছে।"

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "দুঃখ হয় মশাই; আমাদের রবীন্ ছোড়ার টাইফয়েড হয়েছিল! তাঁর স্ত্রী কি না সেবা যত্ন করলে! আঠার দিন তাঁর স্ত্রী প্রায় না খেয়েই ছিল! পয়সা ত আছে! বড় লোকের ছেলে; নার্স রাখতে দিলে না বৌটা! সেও ত বি-এ পাশ মেয়ে!"

রবীন-দম্পতির বয়সের কথা ভদ্রলোক ভুলিয়া যান! আমি বলিলাম, "আপনার ত টাইফয়েড হয়নি; না হলে পরীক্ষা করে দেখা যেতো আপনার স্ত্রী কি করেন? মেয়েদের অত সহজভাবে বিচার করবেন না।"

এমন সময় দঙ্গল বাঁধিয়া চার পাঁচটি মহিলা ঘরে প্রবেশ করিলেন; সম্মুখস্থ মহিলার দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোক কি রকম যেন হইয়া গেলেন; মহিলাটি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বেশ ভালই হ'ল! তোমার জন্যই এসেছি! আচ্ছা বলুন ত জ্যোতিষী মশাই, উনি ওত মনমরা হয়ে থাকেন কেন? আমার ত ভয় হয়, শেষে পাগল-টাগল না হয়ে যান!"

আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "না, না, পাগল হতে যাবেন কেন? আপনার চিন্তায়ই ইনি পাগল হতে বসেছেন ঃ ওকে চোখে চোখে রাখবেন। একা থাকতে দেবেন না; বরং সিনেমায়-টিনেমায় এক সঙ্গে যেতে পারেন।"

সঙ্গের মহিলা-দঙ্গল উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা বিদায় লইলেন। আর ভদ্রলোক আসেন নাই; সম্ভবতঃ আমার প্রেস্‌ক্রিপসনে কাজ হইয়াছে।

# অলৌকিক

এইমাত্র পার্কসার্কাস হইতে ফিরিয়াছি।

ইতিমধ্যে বন্ধুবর চক্রপাণিবাবু আসিয়াছিলেন; তিনি একখানি চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন। চিঠিখানি পড়িয়া মর্মাহত হইলাম; আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে: রাত্রি ১০৷৷০ সাড়ে দশটার সময় ছেলেটি মারা গিয়াছে।

মাত্র দুইটি পংক্তিতে খবরটি লেখা! চার-পাঁচমাস সপ্তাহে সপ্তাহে একদিন করিয়া ছুটিয়া গিয়াছি; ছুটিয়া গিয়াছি বলিলে ভুল করা হয়, আরাম করিয়া গাড়ীতে চাপিয়াই গিয়াছি। বড়লোকের বাড়ী, পাঁচ সাতখানা গাড়ী আছে তাঁহাদের; নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি গাড়ী আসে, চলিয়া যাই। পশ্চিমে তখন সূর্য অস্ত যায়। কলিকাতার বাহিরে মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটে; বড় সুন্দর লাগে সূর্যের ডুবিয়া যাওয়া! সেই ডুবন্ত সূর্যের মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে সেই ছেলেটির মুখ; দুরন্ত রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার মুখে হাসির রেখা! দুরন্ত আবদারে ও আদুরে ছেলে! নড়িতে চড়িতে পারে না! ছয়মাসের উপর রুগ্নশয্যায়। বড় বড় ডাক্তার, বড় বড় বিশেষজ্ঞ—সকলেই একমত; বাঁচিবার আশা নাই। তবুও চিকিৎসা চলে!

আমার সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক? আমি ডাক্তার নই, কিংবা বদ্যিও নই। তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই ছিলনা। স্বপ্নেও ভাবি নাই, এই পরিবারের সঙ্গে এমন ভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিব। হয়তঃ পরিবারের প্রধান ব্যক্তির নামও শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কিংবা তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না! তাঁহার বাড়ীর কোন হদিসও আমি জানিতাম না; কিন্তু একদিন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া গেল।

বিকালবেলা ঘরে বসিয়া রহিয়াছি; অধ্যাপক বন্ধু একজন আসিয়াছেন: তিনি প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ; এমন কি আমার শিক্ষক-স্থানীয়! তাঁহার সঙ্গে গল্পগুজব চলিতেছে। তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন কিনা বুঝিতে পারিনা; কিন্তু জ্যোতিষ আলোচনা করেন; নিজের সম্বন্ধে রসিকতাচ্ছলে এটা-ওটা জিজ্ঞাসাও করেন। অবসরপ্রাপ্ত হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও আবার মোটা মাহিনায় আরামের চাকুরী পাইয়াছেন: চাকুরী না পাইলেও আরো পঞ্চাশ বৎসর অনায়াসে তাঁহার আরামে চলিতে পারে! তবুও বুঝিতে পারি, নবলব্ধ চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার একটা সন্দেহ আছে। আমাদের কথাবার্তা চলিতেছে; এমন সময় সাহেবী পোশাকপরা এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাকে চিনতে পারেন!"

মুখখানি চেনা-চেনা মনে হইল! নাম স্মরণ করতে পারিলাম না; আর আমার একটা দোষও আছে: আমার কাছে চার পাঁচবার আসিয়াছেন, এমন অনেকে আছেন; তাঁহাদের নাম জানিনা; কিংবা কোনদিন নামও জিজ্ঞাসা করি নাই। ভদ্রলোককে বলিলাম, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে, কয়েকমাস আগে আপনি আমার কাছে এসেছিলেন।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, এসেছিলেম; আজ একটা জরুরী কাজে এসেছি, আপনাকে একখানা কোষ্ঠী দেখতে হবে।"

তাঁহাকে বসিতে বলিয়া হাত বাড়াইলাম; একখানা ঠিকুজী বাহির করিয়া তিনি আমার হাতে দিলেন; জন্মের সাল-তারিখ দেখিয়া বুঝিলাম মাত্র সাতবছর বয়সের একটি ছেলের ঠিকুজী! বলিলাম, "এত ছোট ছেলের সম্বন্ধে কি জানতে চান? নিশ্চয়ই অসুখ-বিসুখ করেছে! একটা কথা আছে, আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আয়ু-টায়ুর কথা বলতে পারব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তা না বলুন ঃ এখন কেমন যাবে? রোগ থেকে রেহাই পাবে কিনা বলুন!"

আমি বলিলাম, 'একই কথা হ'ল! ছোটদের অনেক রিষ্টি ফাঁড়া থাকে, এগুলি কাটিয়ে উঠবে কিনা বলা কঠিন হয়। এজন্যই পরাশরের মতে চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আয়ু বিচারই চলে না।'

তিনি বলিলেন, 'রিষ্টি আছে কিনা, তাও আপনাকে দেখ্‌তে হবে ভালভাবে। তারজন্য আপনার পারিশ্রমিক যা লাগে, তা দেওয়া হবে।'

আমি ঠিকুজীখানিতে চোখ বুলাইয়া বলিলাম, "ছেলেটির কোষ্ঠী বড় দুর্বল; দশাও দেখছি খারাপ। গোচরে শনি আর রাহু এখন অত্যন্ত বিরুদ্ধ! আচ্ছা ছেলেটির বুকে আর পেটে কোন অসুখ হয়েছে?"

আগন্তুক বলিলেন, "ঠিকই ধরেছেন ঃ ছেলেটির ক্যানসার জাতীয় কোন কিছু হয়েছে! বুক আর পেটেই অসহ্য যন্ত্রণা; বাইরে কিছুই নেই।"

তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম, "মিছেমিছি আর রিষ্টি বিচারের দরকার কি! আপনি ঠিকুজী নিয়ে যান; আমি এখন কিছুই করতে পারব না।"

আমার কথার উত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেশ আপনি রিষ্টি বিচার না করেন, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু দয়া করে একবার আমার সঙ্গে চলুন, ছেলেটিকে দেখে আসবেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমি ত হাত দেখতে জানিনে; তার আগেই বলেছি ঃ ছোট ছেলেদের আয়ু-টায়ু সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই বলি না। এত ছোট ছেলের এ রকম রোগ; বুঝতেই পারেন আশা কোথায়?"

"আশা নাই সেটা ডাক্তারেরা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন ; যে কোন মুহূর্তে ছেলেটি মারা যেতে পারে ; এটাও আমরা জানি ; তবুও আপনার কাছে ছুটে এসেছি, যদি কোন উপায় থাকে !"—কথাগুলি বলিয়া ভদ্রলোক হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "আপনি একবারটি আমার সঙ্গে চলুন, গাড়ী আছে ; বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

আমি বলিলাম, "আমাকে নিয়ে গিয়ে আপনার কি লাভ হবে ?"

তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি ছেলেটিকে ভাল করতে পারবেন।"

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "সে কি রকম ! দুরন্ত ক্যানসার রোগ ঃ ডাক্তার বদ্যি জবাব দিয়েছে ! আর আমি ত কারো রোগ সারাতে পারি বলে মনে হয় না ! আমি রোগ সারাতে পারি, একথা আপনাকে কে বললে ?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না ; মনে পড়ে, আমি কয়েকমাস আগে একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিলাম ঃ তার ক্রনিক্ ডিস্পেপ্সিয়া ছিল ; আপনি তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, ওসব কিছু নয়, তুমি ভাল হয়ে গেছ !"

এতক্ষণে মনে পড়িল ; ভদ্রলোক একটি বাইশ তেইশ বৎসর বয়সের যুবককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন ঃ সে দারুণ ডিস্পেপ্সিয়ায় ভুগিয়া হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল ! আসিয়াছিল, কোনরূপ সত্যিকারের প্রতিকারের নির্দেশ পাইতে। সেই তরুণটিকে উৎসাহ দিবার জন্যই হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়াছিলাম, এসব কিচ্ছু নয়, তুমি ভাল হয়ে গেছ ; কোন কবচ মাদুলি লাগবে না।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সেই ছেলেটি সেদিন থেকে একদম ভাল হয়ে গেছে।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভদ্রলোকটির বেড়াজাল কাটাইবার উপায় নাই। তিনি নানা প্রলোভন দেখাইলেন। অসুস্থ শিশুটির অভিভাবকদের নাম ও পরিচয় শুনিয়া আমি আরও বিস্মিত হইলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনি কি চান বলুন, চার হাজার, পাঁচ হাজার দশহাজার, বাড়ী,—গাড়ী!"

"না, না ওসব কিছুই আমি চাইনে; ভুল করছেন আপনি! হয়ত সেদিনের যুবকটি কাকতালীয়বৎই ভাল হয়ে গিয়েছে; ওতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমি কোন রোগই ভাল করতে পারিনে; শান্তি স্বস্ত্যয়ন কিংবা কবচ মাদুলিও করিনে। "আমায় মাপ করুন" —বেশ জোর দিয়াই কথাগুলি বলিলাম।"

এইবার চক্রপাণিবাবু (হ্যাঁ, আগন্তুকের নাম চক্রপাণিবাবু) শেষ অনুরোধ করিলেন, "আপনারও ছেলেমেয়ে আছে! একটা কিছু করে দিন যাতে ছেলেটা ভাল হয়।"

মনটা বিচলিত হইল, যদিও কোন শক্তিই আমার নেই; কালী-মূর্তির দিকে চাহিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আজ রাত আটটার পর থেকে যদি ভালর দিকে যায়, আজ মঙ্গলবার, তাহলে বিষ্যুৎবার বিকাল বেলা আমাকে খবর দেবেন।"

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে যথাস্থানে বসিয়া কতকগুলি চিঠির উত্তর লিখিতেছি। একখানি চিঠি লইয়া বড়ই বিব্রত হইলাম; কি যে উত্তর লিখিব, আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছি ঃ

"······প্রায় তিন বৎসর পূর্বে একজনের সঙ্গে আমার বিবাহের ঠিক হয়। আমি তাঁহার বাগ্‌দত্তা। আমি এখনও মনে প্রাণে তাঁহাকেই কামনা করি। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার সঙ্গে আমার একটু মনকষাকষি হয় এবং উহার জন্য আমরা পরস্পরের কাছ হইতে একটু দূরে সরিয়া যাই। বর্তমানে আবার আমাদের দেখা-শুনা চলিতেছে।

কিন্তু তাঁহার মন আমার প্রতি এখনও ঠিক আগের মতন আছে কি না বুঝিতেছি না। তাঁহার মন অন্য কোন নারীতে গিয়া পৌঁছিয়াছে কি না তাহাও বুঝিতেছি না। তাঁহার নাম···রং কালো এবং বেশ স্বাস্থ্যবান ; বেঁটেসেঁটে এবং খুব কর্মঠ। ······আমি জীবনে তাঁহাকে পাইব কি না? যদি অন্য নারীতে তাঁহার আসক্তি হইয়া থাকে তবে তাঁহার মন আমার দিকে আকৃষ্ট করিবার এবং জীবনে তাঁহাকে পাইবার কি উপায়?···আমি বড়ই অস্থির হইয়া আছি।···আমার বয়স পূর্ণ ৩৬ বৎসর।···"

মনে মনে হাসি; করুণারও উদ্রেক হয়। সত্যই বড় কঠিন সমস্যা! একটা সিগারেট ধরাইলাম; এমন সময় হাসিমুখে সশব্দে চক্রপাণিবাবু হাজির হইলেন। তিনি আজ একা নহেন; সঙ্গে আরও দুই চারিজন ভদ্রলোক আছেন। আমার ক্ষুদ্র কুটীরে এতগুলি লোকের বসিবার মত আসনও নাই। ইতস্ততঃ করিয়া দাঁড়াইলাম। চক্রাপাণিবাবু বলিলেন, "থাক আজ, আমরা বসব না; সেই খবরটা দিতে এলাম। ছেলেটি ভালর দিকে যাচ্ছে।"

সেই মুমুর্ষু ছেলেটির কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, "দেখুন, ভগবানের দয়ায় অঘটনও ঘটে যায়।"

চক্রপাণিবাবু বলিলেন, "আজ আর ছাড়ছিনে; আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এর জন্য যা চান, তা পাবেন।"

আমি বলিলাম, "দেখুন চক্রপাণিবাবু, আমি ডাক্তার বদ্যি নই; মন্ত্রবিদ্ তান্ত্রিক কিংবা নেপালবাবার মত রোগ সারাবার মত ক্ষমতাও আমার নেই। আমি মিছেমিছি গিয়ে কি করব?"

চক্রপাণিবাবু বলিলেন, "আপনি যা-ই মনে করুন না কেন, আমাদের মন বলছে, আপনি ছেলেটিকে ছুঁয়ে দিলেই উপকার হবে; একবার দয়া করে চলুন।"

বিলাতফেরত ইঞ্জিনীয়ার এই চক্রপাণিবাবু। নানাভাবে বিদ্রূপ মন্তব্য করিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম, "বেশ আজ সন্ধ্যার পর যাব, কিন্তু একটা কথা, আমাকে টাকাপয়সা দিতে চাইলে আমি যাব না।"

কেন গিয়াছিলাম? টাকার লোভে নয়। ছেলেটি ভাল হইয়া উঠুক আর নাই উঠুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না; তাঁহাদের বিশ্বাস ও আগ্রহ এমনই ছিল যে, এই একটি দিনের জন্য চার পাঁচ হাজার টাকা দাবী করিলেও তাঁহারা তাহা পূরণ করিতেন। ছোট ছেলে রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে? এ রকম করুণ দৃশ্যের অবতারণা তিন বৎসর আগে আমারই গৃহে হইয়াছিল: আমার রোগকাতর মেয়েটির মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠে এখনও মাঝে মাঝে। চক্রপাণিবাবু যখন বলিলেন, "আপনারও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে; মা-বাপের মন বুঝতেই পারেন; তাঁরা একটু সান্ত্বনা পান।"

হ্যাঁ, সান্ত্বনা! আমার পাঁচ বৎসরের শিশু কন্যার কথা মনে পড়ে; আমিও বড় বড় ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ দেখাইয়া নিরাশ হইয়াছিলাম; তখনই তান্ত্রিক, দৈবজ্ঞ ও পীর-ফকিরের সন্ধানে ছুটিয়াছি! ঘন অন্ধকারে 'প্রবাসী' পত্রিকার কাছাকাছি ফুটপাতে এক দিব্য পুরুষ পাগলের বেশে কোন কোন শনি ও মঙ্গলবারে বসিয়া থাকেন! বন্ধু কাশীবাবু এই খবর দিলেন। তিনি নাকি যাঁহার উপর প্রসন্ন হয়েন, তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করেন। সেই দিব্য-পাগলের অনুগ্রহে কেহ বা রেসের টিপ পাইয়াছে, কেহ বা ফাঁসির মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, কেহবা দুরন্ত কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছে! আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মধ্যেও দুই তিন দিন অন্ধকারে মাণিকতলার মোড় হইতে রাজাবাজারের মোড় পর্যন্ত চষিয়া ফেলিলাম! দিব্য-পুরুষের সাক্ষাৎ মিলিল না; শুধু একদিন দেখিলাম অন্ধকারে নোংরা ছেঁড়া কাপড় কোনরকমে গায়ে

জড়াইয়া বিকট হিঃ হিঃ শব্দ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে একটা পাগলী। ফুটপাতে ঘুমায় কত রকমের লোক! মুটে মজুর, ভিখারী আবার যাযাবর বেদের দল! শতচ্ছিন্ন বসনে আবৃতা এক নারী; সে একটি ছোট শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ় ঘুমে অচেতন; অদূরে এক পাগল বসিয়া বিড় বিড় করিতেছে। একবার মনে হইল এই সেই দিব্য পাগল; কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। পাগল ইট ছুঁড়িয়া মারিল; আর সাহস হইল না। কাশীবাবু বলিয়াছিলেন, দিব্য পাগলের কাছে ভক্তেরা ভিড় করিয়া থাকে; কিন্তু এই রকমের কাহারও সন্ধান মিলিল না। মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা বাড়িল! আমি যে পিতা!

সন্ধ্যার সময় গাড়ী আসিল; কলিকাতার বাহিরে—মাঠের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা রাস্তা; অদূরে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে। নূতন শহরের পত্তন হইয়াছে। তাহারই একাংশে বিরাট অট্টালিকা। রোগীর ঘরে গেলাম; আমার ত চক্ষু স্থির; যেন মেডিকেল কলেজের কোন সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি; ডাক্তার, নার্স ও আয়া সকলেই কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত। ঘরের মাঝখানে রোগীর খাট; একপাশে একখানি টুলের উপর বসিয়া রহিয়াছেন এক অভিজাত মহিলা; পরে বুঝিলাম ইনিই ছেলের মা!

চক্রপাণিবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন; সকলেই আমাকে খুব খাতির যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমি সঙ্কোচ কাটাইয়া ছেলেটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম; মুখে তাঁহার প্রশান্ত হাসি; কিন্তু অস্থিরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে; বড়ই শীর্ণ হইয়াছে তাঁহার দেহখানি; নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। আমি কি করিব? মনে মনে প্রশ্ন জাগিল,—এই মুমূর্ষু শিশুর জন্য আমি কি করিতে পারি! প্রার্থনা—হুমায়ুন ও বাবরের কাহিনী মনে পড়িল! জগতে অসম্ভব কিছুই নয়! মুমূর্ষু পুত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া বাবর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

করিয়াছিলেন, আমার প্রাণ লইয়া আমার ছেলেকে বাঁচাও। ইহা কি অসম্ভব? পরের ছেলের জন্য প্রাণ দেওয়া চলে না! তবুও প্রার্থনা করি, ভগবান্ নিষ্পাপ শিশুকে আর যন্ত্রণা দিও না; শীর্ণ হাত দুইখানি হাতে তুলিয়া লই; আমার জীবনের রসধারা ছেলেটিকে সঞ্জীবিত করুক।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম: একজন ডাক্তার পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, "কি বলেন একদম আশা নেই; দু'চার দিনেই সব শেষ হয়ে যেতে পারে!" উত্তর দিলাম না। ছেলের পিতা আকুলভাবে ধরিলেন, "বলুন কি হবে?" আমার বলিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধে স্বীকার করিলাম, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়া দেখিয়া যাইব।

শেষ পর্যন্ত কথা রাখিলাম: আশ্চর্য কাণ্ড সেইদিন হইতে ছেলেটি আরোগ্যের পথে চলিল; মাসখানেকের মধ্যে বিশেষ সুলক্ষণ দেখা দিল; ইতিমধ্যে এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নূতন ঔষধও আসিয়া পৌঁছিল। ছেলেটি প্রায় ভাল হইয়া গিয়াছে!

তবুও গাড়ী আসে; ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। চক্রপাণিবাবু এখন আমার পারিবারিক বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন। দৃঢ়চেতা, কর্মনিষ্ঠ ও প্রতিভাবান এই বিজ্ঞানধর্মী মানুষটিকে আমার সত্যই বড় ভাল লাগে। প্রায় প্রত্যহ আসেন চক্রপাণিবাবু; ছেলেটির অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনার আর অন্ত নাই।

তারপর হঠাৎ একদিন চক্রপাণিবাবু আসিয়া বলিলেন, "আপনি এক্ষুণি চলুন: ছেলেটির অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে।'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সে কি কথা? আমি ত তিনদিন আগেও দেখে এসেছি: ছেলেটি বিছানায় বসে ছবি আঁকছে।"

চক্রাপাণিবাবু কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সবই নিয়তি! হঠাৎ এমন খারাপ টার্ণ নিয়েছে যে, আগের চেয়েও অবস্থা খারাপ।"

দ্বিধা না করিয়াই চক্রপাণিবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম। ছেলেটির অবস্থা সত্যই খারাপ ; মুখে সেই হাসি নাই ; বিষাদ মলিন রোগকাতর পাণ্ডুর মুখখানি তবুও প্রশান্ত। গায়ে ভীষণ জ্বর ; কপালে হাত বুলাইয়া দিলাম। স্নেহ-দুর্বলতা আমাকেও কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে এই পরিবারে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। ছেলেটি যেন এই বিরাট পরিবারের মধ্যমণি! সকলেই আকুল, সকলেই ব্যগ্র!

বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম ঃ ছেলেটিকে ভাল করিতে হইবে! তন্ত্রমন্ত্রের বই ঘাঁটিলাম ; এইবার কিন্তু রোগীকে আরোগ্য করিবার জন্য পূজাপাঠ ও হোমের আয়োজন করিলাম ঃ সদাশিবের পূজা করিলাম —শিশুরিষ্টি নাশের জন্য! অবশ্য একজন বয়োবৃদ্ধ নামজাদা তান্ত্রিক জ্যোতিষীর পরামর্শ লইতে গেলাম ঃ তিনি দেখিয়া শুনিয়া এই ব্যবস্থা দিলেন বলিলেন, "প্রায় হাজার দেড়েক টাকা খরচ পড়বে; তোমার কোন ভাবনা নেই ; আমিই সব করেকম্মে দেবো।" আমি বলিলাম, "এত টাকা কোথায় পাব?" তিনি বলিলেন. "ওরা বড়লোক, তোমার উপর বিশ্বাস আছে ; তুমি চাইলেই দেবে।" আমি বলিলাম, "সে হয় না। আমি নিজেই যা পারি করব।" তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন, "তুমি করলে কোন ফলই হবে না ; ওঁরা পাপ করেছে ; তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ওদের টাকা খরচ করতে হবে।" বৃদ্ধ তান্ত্রিকের উপদেশ মনঃপূত হইল না।

মনে পড়িল, ওই জাতীয় তান্ত্রিকেরা সকলেই এক শ্রেণীর ; অনেক সময় এমন অসম্ভব কিছু প্রতিকার নির্দেশ করে, যাহা সংগ্রহ করাই দুষ্কর হইয়া উঠে। যাগযজ্ঞ ও জপহোমের ত কথাই নাই। পঁচাত্তর টাকা মাহিনার এক কেরাণীকে এক জ্যোতিষী ভুবনেশ্বরীর পূজা ও কবচের জন্য দেড়হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন! আমারই

শিশুমেয়ের অসুখ সারাইবার জন্য এক তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "অপাপবিদ্ধা কুমারী মেয়ের স্তন্য দুগ্ধ নিয়ে এসো; মন্ত্রপূত করে দেবো। তা খাওয়ালেই রোগ সেরে যাবে।" আমি তাঁহার কথায় আশার আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম ঃ কিন্তু সেই দুর্বল ও উন্মনা মুহূর্তে আমারও সাধারণ বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া যখন খুশীমনে সে কথা প্রকাশ করিলাম, তখন সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির কারণটাও ধরিতে পারি নাই। বন্ধু কালিদাসবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কুমারী মেয়ের স্তন্যদুগ্ধ কোথা পাবেন? মেয়েরা সন্তানবতী না হ'লে স্তনে দুগ্ধ হয় না। এ বুদ্ধিটা আপনার হল না!" আবার হাসির পালা! তখন বিশেষ লজ্জিতই হইলাম। কিন্তু রামদুলাল বলিল, "কেন হবে না; কামধেনু সুরভির কথা শুনেন নি? আমাদের গাঁয়ে এরূপ একটি সুরভি গাই ছিল; সেই সুরভি গাইকে কত যত্ন ক'রে রাখা হয়েছিল ঃ ব্রাহ্মণেরা পূজো করতেন।" কিন্তু মানুষের মধ্যে সুরভি! সে যে অবাস্তব কল্পনা!

যাহাই হউক, সেই ছেলেটির কিছু উপকার হইল! সেই বাড়ীতে একটি বিশেষ উৎসব-বাসরে ছেলেটির কাছে আমাকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা থাকিতে হইল! ডাক্তারেরা ভয় দেখাইয়াছেন ঃ উৎসব পণ্ড হইতে পারে! কিন্তু তাহা পণ্ড হয় নাই!

অলৌকিক অজানাকে কত সাধ্যসাধনা করিলাম ঃ কিন্তু হতাশ হইলাম ঃ কি জানি কেন, একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সংকট-মুহূর্তে ছেলেটিকে আমি স্পর্শ করিলে সংকট কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সংকট-মুহূর্তে আমি পৌঁছাইতে পারিলাম না।

এখন অস্তমান ডুবন্ত সূর্যের মাঝে দেখি, সেই ছেলের মুখচ্ছবি; ঐ সময়ে আমার গাড়ী শহরতলী ছাড়াইয়া পশ্চিম মুখে ছুটিত!

# চাবি-কাঠি

"বুঝলেন ভট্‌চার্যি-মশাই, এই চাবি-কাঠি হয়ত আমার মুঠোর মধ্যে এরকম থেকেই যাবে।"

ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর হইতে চাবির রিং তুলিয়া লইয়া বর্ষীয়ান মহাপ্রাজ্ঞ এক ভদ্রলোক হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু কোনদিন তাঁকে ডাকতে পারিনি; সুতরাং আজ তাঁর উপরও নির্ভর করতে পারছি নে। ওই তিনি, দু'মিনিট চোখ বুঁজে তাঁর কথা ভাবতে পারি, এমন ধৈর্যও আমার নেই।" সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো নারায়ণের ছবির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তিনি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"আজ দেখছি সবই শূন্য; পনেরো টাকার সামান্য চাকুরীও আমি একদিন করেছি; লাখ লাখ টাকা আজ আমার কাছে কিছুই নয়। বড় বড় পরীক্ষায় সুনাম হয়েছে; বিলেত গেছি; ফিরে এসে আইন ব্যবসায় করেছি; বহু টাকা রোজগার করেছি! সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তারপর সম্মান, পদমর্যাদা—একের পর এক এসেছে; সে-সব আপনারা জানেন; কিন্তু আজ দেখছি সবই বুদ্‌বুদ্‌। শূন্য, শূন্য—সবই শূন্য—'জিরো'।" তিনি উত্তরের অবকাশ না দিয়া নিজের কথাই বলিতে লাগিলেন।

"বাড়ী, গাড়ী, টাকা! কিসের অভাব আমার! ওই আমায় স্ত্রী; আপনার সামনেই তিনি রয়েছেন! কি না পেয়েছেন তিনি? কিন্তু আজ তাঁর কাছেও সব শূন্য। বাড়ীতে সাত-আটটা চাকর-বাকর। কি সুন্দর আমার বাড়ী; ইংরেজ লাটদেরও ঈর্ষা হত! সেই বাড়ী এই ত রয়েছে; তেমনই সুন্দর! কিন্তু সবই মনে হচ্ছে স্বপ্ন; শুধু স্বপ্ন! সব পড়ে থাকবে! সমস্যা এই চাবিকাঠি নিয়ে।"

নির্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূতের মত তাঁহার কথা শুনি। আমার হাতে তাঁহার রাশিচক্র। জীবন-সায়াহ্নে অবসর ক্লান্ত জীবনে তাঁহার মুখ দিয়া জীবন-দর্শন উচ্চারিত হইতেছে। উত্তর দিবার মত কথা বা ভাষা আমার নাই। তাঁহার জীবনের শেষ কথা শুনিবার জন্য তিনি জ্যোতিষীকে ডাকিয়াছেন; মহাপ্রাজ্ঞ এই পুরুষের কোষ্ঠী-বিচার করিব আমি! তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম; মাঝে মাঝে দুই-একটি কথা বলি : "আপনার এত ভাবনা কিসের?"

আবেগে ভরিয়া উঠে তাঁহার মন; লক্ষ্য করি তাঁহার মধ্যে এক শূন্যতার আক্ষেপ মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

"নেই নেই,—আমাদের কেউ নেই; আমরা দু'জনই আজ বড় নিঃসঙ্গ। অথচ আমাদের সবই আছে। আরো পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকলেও আমাদের এতটুকু অভাব হবে না; এত টাকা আছে আমার! রাজার মত থাকতে পারি আমি। লোককে যে ভালবাসিনে তাও নয়; তবু কেউ আসে না! কি করে আসবে? তাদেরও সংসার আছে; কাজকর্ম আছে। আর যারা আসে, তারা স্বার্থের জন্যই আসে। সবই দিতে পারি আমি; কোন মোহই আমার নেই। কিন্তু আমি চাই দরদী মন।"—বলিতে বলিতে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়; ক্লান্ত হইয়া উঠেন তিনি।

বেয়ারা সম্মুখের টেবিলে গরম মিছরির জল রাখিয়া যায়; মাঝে মাঝে দুই-এক চামচ মুখে দেন। তারপর আবার বলিতে থাকেন, "দু'বছর আগে আমার স্ত্রীর শক্ত অসুখ করে; বাঁচবার আশা ছিল না; সেই থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। তাঁর কথাই ভাবি; কেউ নেই; কাকে নিয়ে সময় কাটবে?"

ইঁহারা যে নিঃসন্তান তাহা আমি জানিতাম না। ছবির মত বাড়ী; মার্বেল পাথর তকতক ধবধব করিতেছে; বাগান আর 'লন',—বাড়ীর

চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। দোতলা বাড়ী; অনেকগুলি ঘর; সবগুলি ঘরই সাজানো-গোছানো। প্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর চাকর ঝাড়িয়া মুছিয়া সব পরিষ্কার করে। প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে ছিলাম; ইহার মধ্যে তিন-চারিবার মেঝে মুছিয়া গেল।

দোতলার দক্ষিণদিকের প্রকাণ্ড বারান্দায় আমরা বসিয়া আছি। অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পড়ে মহাপ্রাজ্ঞ সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষের মুখে।

যদিও মুখ-চোখের সেই দীপ্তি নাই; চেহারা শীর্ণ ও কাহিল হইয়া গিয়াছে; চোখ দুইটি প্রায় ঘোলাটে; তথাপি তাঁহার মুখে দেখি, তেজস্বী এক পৌরুষ দীপ্তি।

বহু দিন দূর হইতে এই মানুষটিকে দেখিয়াছি; কোনদিন তাঁহার এত কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিব, এইরূপ কল্পনাও করি নাই। পদগৌরবে গরীয়ান তিনি একটির পর আরেকটি ধাপে উঠিতেছিলেন।

নীতিবাদিতায় তিনি সকলের কাছেই নির্মম-নিষ্ঠুর বলিয়াই পরিচিত; সংগঠন-ক্ষমতাও তাঁহার ছিল প্রচুর। সেই তেজস্বী পুরুষ আজ আমার সম্মুখে। নিতান্ত সহজ ও সরল মানুষের মত অন্তরের কথা ব্যক্ত করিতেছেন। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কোষ্ঠী দেখিলাম। তাঁহার কোষ্ঠীর এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা দেখিয়া এতখানি কল্পনা করা যাইতে পারে। বর্তমান সময় উভয়ের খারাপ; কোষ্ঠী অনুযায়ী শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ বলা চলে।

ভদ্রলোক নিজেই জ্যোতিষ জানেন; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেই একটা ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "আপনার ধারণাই ঠিক; সময়টা খারাপ; দ্বাদশস্থ কেতুর দশা ভাল যেতে পারে না।"

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "স্পষ্ট করে বলাই ভাল, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। বড় জোর আর পাঁচ বছর। এমন

কি সামনের শ্রাবণেই একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। আমার স্ত্রীরও সময় হয়ে এসেছে; আমার আগে হ'লেই ভাল হয়। অবশ্যি আমার খুব কষ্ট হবে। তবু বেচারী বড় একা। বড় নিঃসঙ্গ।"

সম্মুখে বসিয়া বর্ষীয়সী মহিলা; স্বামীর কথায় বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠেন। আমি বলিলাম, "এসব কথা বলে এঁর মনটা আরো দুর্বল করে তুলছেন আপনি।"

তিনি ম্লানহাসি হাসিয়া উত্তর দেন, "না, না, যা ঘটবে, তা স্পষ্ট করে বলাই ভাল; এতে ঢাকাঢাকির কোন কিছুই নেই। তাঁকে তৈরী হতে হবে। সত্যি কথা বুঝিয়ে বলাই ভাল। তা না হলে হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে ইনি সহ্য করতে পারবেন না।"

এই কথার উত্তর দেওয়া চলে না; বুঝিলাম, সত্যিই ভদ্রলোক নির্মম-নিষ্ঠুর। তথাপি কত দরদী তাঁহার মন! তিনি বলিলেন, "জানেন ভট্‌চার্যি-মশাই, স্ত্রীর মত আপনার জন জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই; মৃত্যুকালে কিংবা অসময়ে এমন নিকট বন্ধু কাছে না থাকলে বড় কষ্ট হয়; তবুও এঁর কোন অবলম্বন নেই; ইনি যদি আমার আগে মারা যান, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

আমি বলিলাম, কেতুর দশায়ই যে আয়ু শেষ হবে, তা বলা চলে না; শুক্রই আপনার মারক!"

তিনি বলিলেন, "তাও আমি জানি; কিন্তু আমার মনে হয়, আমার সবই শেষ হয়ে গেছে; বই না পড়ে, শুধু চিন্তা ক'রে বড় বড় জটিল মামলার সমাধান করেছি; আজ সেই চিন্তাশক্তিই আমায় বলছে,—সবই শেষ হয়ে গেছে। এ শূন্যের মধ্যে বাঁচা যায় না। আর আমিও বাঁচতে চাইনে।"

আমি উত্তর দিলাম, "আপনার-আমার চাওয়া না-চাওয়ার উপর ত জীবন নির্ভর করে না।"

তিনি বলিলেন, "তা সত্যি, তবুও আমার অনুভূতি থেকে বলছি, সব শেষ হয়ে গেছে। এত শূন্যতা বোধ আমার হ'ত না, যদি কোন অবলম্বন থাকত; জানেন ভট্‌চার্যি-মশাই, মানুষ শেষ বয়সে হয় ছেলের উপর, না হয় ভগবানের উপর নির্ভর করতে পারে। ফেলে যাওয়া সব তুলে দেয় ছেলের উপরে, আর আঁধারের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভগবানের উপর নির্ভর করে। আমার যে কিছুই নেই!"

আমি বলিলাম, "আপনাদের মত জ্ঞানীলোকেরাই যদি এরকম হতাশ হয়ে পড়েন, তাহলে কি করে চলে! (তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলাম) উনি ত আপনার কথা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেছেন দেখছি।"

তিনি বলিলেন, "এজন্যেই তাঁকে জপতপ করতে বলি; আমি তা পারিনে। দু'মিনিট চোখ বুঁজে ভগবানকে ডাকতে পারিনে। জীবনে কোন দিন অন্যায় করিনি; তবুও কেন পারিনে বলতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "কেন পারবেন না; এতদিন নানা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন; এখন কাজের অভাবেই মনটা এত শূন্য হয়ে গেছে।"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন; কাজ চাই, কাজ! কাজই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে; অকর্মারাই শীগগির বুড়ো হয়ে পড়ে; কিন্তু কাজ করবার শক্তি যে হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ একটা ছেদ পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে যদি থাকত, তাদের কাজকর্ম দেখে তবু তৃপ্তি পেতাম!"

সান্ত্বনার সুরে বলিলাম, "ছেলেমেয়ে থাকলেই মানুষ সুখী হতে পারে একথাটাও ঠিক নয়; তারা যদি মানুষ হয়ে না উঠে, তাহলে আরো বেশি কষ্ট হয়।"

তিনি বলিলেন, "তাও জানি, অনেক ছেলে বুড়ো বাপ-মাকে দেখে না,—বরং দুর্ব্যবহার করে; তাও জানি। তবু,—তবু তারাই ভগবানের দান; তারাই নির্ভরের ক্ষেত্র।"

আমি বলিলাম, "তারা যদি বাপমায়ের দুঃখকষ্ট না বুঝে, তাঁদের সেবাযত্ন না করে, তাহলে বিড়ম্বনার শেষ থাকে না।"

তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "এও অদৃষ্টের খেলা! ভগবানই ছেলেমেয়েদের পাঠান! ওই যে কচি-কচি হাসি মুখ ছেলে-মেয়েগুলি ; আপনি কি বলতে চান, তারা ভগবানের দান নয়? দোষ আমাদের। সে দানের মর্যাদা রাখিনে ; তাদের গড়ে তুলতে পারিনে, তাই এত বিড়ম্বনা!"

বুঝিলাম, নিঃসন্তানের বুকের ব্যথা! কি তীব্র স্নেহ-মমতার আবেগ ; ক্ষুধা অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে! স্নেহ-মমতা বাৎসল্যের পরিতৃপ্তি না হওয়া একটা অভিশাপ! আজ এই বর্ষীয়ান্ মহাপ্রাজ্ঞ তাই এইরূপ শূন্যভাবোধ করিতেছেন।

তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ; শিশুদের গড়ে তুলতে আমরা পারি নে, সেইজন্যই এত দুঃখ পেতে হয়।"

তিনি বলিলেন, "আমার কি মনে হয় জানেন? সংসার করতে যারা আসে, তাদের জন্যই ছেলেমেয়ে! ভগবান তাদেরই ছেলেমেয়ে দেন ; আর যারা করবে দেশের কাজ, দশের কাজ, ভগবানের কাজ, তাদেরই ছেলেমেয়ে হয় না বা হবে না। এটাই ভগবানের ইচ্ছে! একথাটা আগে বুঝতে পারিনি! আমাদের জন্যই সন্ন্যাস!"

যেন বিচারকের আসন হইতে ধীর-গম্ভীর স্বরে বর্ষীয়ান্ বিচারক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ 'রায়'-দান করিতেছেন : মানুষের জীবন-দর্শনের 'রায়'!

"সৃষ্টির ধারা বজায় রাখবার জন্যই সন্তান ; সংসারের কাজের জন্য যাদের প্রয়োজন, তাদেরই হবে সন্তান ; ভগবান্ তাদেরই ঘরে ছেলে-মেয়ে পাঠান ; এতে ধনী-দরিদ্র বিচার নেই। ভগবানকে না ডাকলেও সংসারী যারা, তাদের চলে। সংসারের কাজ করলেই ভগবানের কাজ

করা হয়; আর তাদের সেবার জন্যই চাই নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ সন্তানহীন ব্রহ্মচারীর দল।”

তাঁহার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রক্তিমাভ সূর্যের শেষরশ্মি তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে। আমার মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসিল। নূতন কথা শুনিলাম; প্রাণের আবেগে তিনি কত কথা বলিতে লাগিলেন।

“পাঁচ বছর আগেও ভাবিনি,—সে আসবে না, আমার সন্তান, আমার ছেলে কিংবা একটি মেয়ে! অন্ধ হোক, খঞ্জ হোক, চোর হোক, বদমাস হোক; মূর্খ হোক, আর মহাপণ্ডিতই হোক; আমারই ছেলে! বহুদিন পথ চেয়ে রয়েছি দুজনে। বয়স ছিল; যৌবন, স্বাস্থ্য সবই ছিল। তারপর কাজের ভিড়ে, কাজের উন্মাদনায় সব ভুলে গেছি; যৌবন যে কবে চলে গেছে, বুঝতেই পারিনি। চার বছর আগে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পেলাম; বিছানায় শুয়ে থাকতে হল দশ-পনেরো দিন; সেই থেকে সব কাজে ছেদ পড়ল; তখন দেখলাম, কখন ষাট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে! সে আর আসবে না! আমি এ কি করেছি! সবই যে শূন্য! সংসার সাজিয়েছি; কিন্তু সংসার ত আমার জন্য নয়! বড় বড় মামলার ‘রায়’ দিয়েছি; আমার নিজের বিচার ত কোন দিন করিনি!”

তিনি বারবার মিছরির জল খাইতে লাগিলেন। আমি আজ এক নূতন জগতে আসিয়াছি; জ্যোতিষী-হিসাবে আমার নূতন অভিজ্ঞতা! মহাপ্রাজ্ঞ এই পুরুষের নিকট অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। তিনি এইবার আমাকে বলিলেন, “আপনার লেখা আমার ভাল লাগে, তাই আমার বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলাম; কষ্ট দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না!”

আমি উত্তর দিলাম, “না, আপনার কথাগুলো আমার ভালই লাগছে; এতে কষ্ট হবার কথা নয়!”

তিনি বলিলেন, "সত্যি আপনি জ্যোতিষ জানেন ; আপনি আমার কোষ্ঠী দেখতে এসেছেন ; আমার টাকা দেখে কিংবা আমায় বড়লোক দেখে আসেন নি, এতেই আমি সুখী। আপনি স্পষ্ট কথাই বলেছেন ; হ্যাঁ, চার বছর বড় সংকটের ; তা আমি জানি।"

তিনি অনেক জ্যোতিষীর নাম করিলেন ; "কেউ ঠিক কথা বলে না বা বলার চেষ্টাও করেন না। কেবল আমার টাকা দেখে এসেছে! বড় বড় কথা বলেছে। আরে মূর্খের দল, আমি কি মরণের ভয়ে ভীত? তোরা আমাকে বিরাশির কোঠায় পৌঁছে দিয়ে ঠেকাতে পারবি!" তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন!

চাবির গোছা তাঁহার হাতে রহিয়াছে। বারবার চাবির গোছা নাড়াচাড়া করিতে থাকেন ; তারপর বলেন, "এই চাবিকাঠিই গোলমাল বাঁধিয়েছে। কার হাতে এটা দিয়ে যাব?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি চারিদিকে তাকাইলেন ; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন।

"চাবিকাঠির গল্প জানেন ভট্চার্যি-মশাই ; গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। আমারই এক মক্কেল ; খুব বড় লোক। কয়েক লাখটাকা আছে ব্যাঙ্কে; বাড়ী-গাড়ী কিছুরই অভাব নেই। ছেলেপিলে হয় নি ; তাঁর স্ত্রী আগেই মারা গেলেন। তবুও চাকর-বাকর পুষ্যিতে বাড়ী গমগম করে। ভদ্রলোক শেষ বয়সে উইল করে টাকাকড়ি বিষয়আশয়ের একটা বিলি-ব্যবস্থা করলেন ; কিন্তু উইল দস্তখত করা আর হ'লনা, বললেন, সময় হলেই করব। তাঁর ধারণা ছিল, সই করলেই সব অন্যদের হাতে চলে যাবে ; বেঁচে থাকতেই তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়বেন ; যারা বিষয় পাবে, তারা আর তেমন দরদ দেখাবে না! এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।"

গল্পটি বলিবার সময় তিনি মাঝে মাঝে হাতের মুঠার মধ্যে চাবির গোছা চাপিয়া ধরেন ; কিছুই বুঝিতে পারি না।

তারপর আবার আরম্ভ করিলেন, "শেষে কি হল জানেন? হঠাৎ একদিন থ্রম্বোসিসে তাঁকে ধরল; চেতনাহীন হলেন তিনি, কিন্তু হাতের মুঠোয় তাঁর সিন্দুকের চাবি। ডাক্তার এ'ল; ওষুধপত্র, ইন্‌জেকশন—সবই বৃথা! উইলে আর সই করা হল না। হাতের মুঠো থেকে কিছুতেই চাবি বের করা যায় না; যতই শেষ সময় নিকটতর হ'তে লাগল, মুঠোও তত কঠিন হতে লাগল। শুনেছি, আঙ্গুল কেটে শেষে চাবি বের করতে হয়েছিল! এতই সম্পদের মায়া! ভদ্রলোকের কোন ছেলেমেয়ে থাকলে কি অমন হতে পারত? না, না, কক্ষনো না!"

বক্তৃতার মত কথাগুলি শুনাইতে লাগিল: আমি বলিলাম, "এরূপ ঘটনা শুনিনি; তবে টাকাপয়সার মায়ায় মানুষ কত অন্যায় করে, তা দেখেছি বা শুনেছি।"

তিনি বলিলেন, "আমাদের কোন সন্তান হয় নি; পোষ্যপুত্র রাখবার কথা কোন দিনই ভাবিনি। আগেই ব'লেছি, আমরা তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। স্বপ্ন যখন ভাঙ্গল, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। স্বজনদের কোন ছেলেমেয়েকে হয়ত রাখতে পারতেম, কিন্তু ফিরে দেখি তাদেরও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে অনেক্‌খানি। তার আর পূরণ হয় না।"

আক্ষেপের সুর বাজিয়া উঠিল। তাঁহাকে কোনরূপ সান্ত্বনা দিতে পারি, এমন কথা আমার জোগায় না; আমি বলিলাম, "দশের উপকারে দান করতে পারেন।"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই করব! কিন্তু চিন্তায় পড়েছি আমার স্ত্রীকে নিয়ে; ইনি কাকে অবলম্বন করে থাকবেন। বড় একা, কথা বলবার লোক নেই; সুখদুঃখের কথা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আর কত হ'তে পারে? আর ঘরে দু'জনে মুখোমুখি বসে কি কথা তাঁকে সারাদিন

বলতে পারি! স্বামী আমি, আমার কাজ ফুরিয়েছে; এখন ছেলে-মেয়ের কাজ, নাতি-নাতনির কাজ। ওঁর পাকা চুল বেছে দেবে! উনি রূপকথা শুনাবেন! হাসি-দুষ্টুমি, কান্নাকাটিতে বাড়ীতে টেঁকা দায় হবে; এইত চাই; বার্ধক্যে এতেই সুখ! ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি আসবে; প্রণাম করবে; দু'এক কথা জিজ্ঞেস করবে; নাতিরা চাবি কেড়ে নেবে; নাতনিরা টাকার ব্যাগ লুকিয়ে রাখবে; টাকা-পয়সা চুরি করবে;—বুঝলেন, তাতেই সুখ।"

নিজের কথা ভাবিলাম: ছেলেমেয়ের জ্বালায় অনেক সময় অস্থির হইয়া উঠি। কত উৎপাত করে তারা! এই ভদ্রলোক ভুক্তভোগী নহেন; কল্পনার নেত্রে তাই সবই সুন্দর দেখেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলি আমাকে মুগ্ধ করিল। মনে পড়িয়া গেল আমার জ্যোতির্ময় গুরুর বাণী:

"বাবা, এঁরা ভগবানের দান; এঁদের দিয়েই ভগবান তোমায় পরীক্ষা করছেন। ছেলেমেয়ের দু'একটা অন্যায় আবদার যদি সহ্য করতে না পার, তাহলে চলবে কি করে! ভাব দেখি, আমরা পরম পিতার কাছে কত অন্যায় করছি, তিনি ত আমাদের ক্ষমা করছেন; সূর্য আলো দিচ্ছে, পৃথিবী শস্য দিচ্ছে, জল দিচ্ছে; তিনি ক্ষমা করছেন বলেই ত আমরা বেঁচে আছি। ছেলেমেয়ের দোষ ক্ষমা না করতে পারলে তাঁর ক্ষমা পাওয়া যায় না বাবা! যেদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে ক্ষমা চাইবে, তখন তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, নিজের ছেলেমেয়েকে কি ক্ষমা করতে পেরেছ? তখন কি উত্তর দেবে?"

আমার সম্মুখস্থ সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষের মুখে তাঁহারই প্রতিধ্বনি নূতন ভাবে শুনিলাম: তিনি বলিলেন, "দেশের কিংবা দশের উপকারে আমি এক পয়সাও দেবো না। আমার যা কিছু টাকাকড়ি, বাড়ীঘর

সবই দান করছি,—ওই শিশুদের গড়ে তোলার কাজে। আমি মানুষ গড়ে তুলতে চাই; ওরাই নারায়ণ; ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ। বাকী জীবনটা ওদেরই সেবা করে কাটাব। পরে নয়, এখনই কাজ আরম্ভ করব; আমার আদর্শ অন্য কেউ বুঝবে না; আমি নিজেই কাজ আরম্ভ করব; আমার সহকর্মী হবে যারা, তারা সন্তানহীন নিস্বার্থ; আমার স্ত্রী হবেন প্রথম সহযাত্রী। তা হলে তাঁর অবলম্বন জুটে যাবে, আমি আগে মারা গেলে ওঁর কষ্ট হবে না। চাবিকাঠি আমার হাতে রাখব না; তা না করলে শেষে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে যাবে। আজই তার একটা মুসাবিদা করে ফেলেছি!

সূর্য অস্ত গেল, বিজলি-বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলাম; দূর হইতে পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম,—স্বামী-স্ত্রী দুইজনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—দুইটি শ্বেতপাথরের মূর্তি!

## চলচ্চিত্র

সত্যশরণবাবু গল্প করিতেছেন ঃ

"বদলি বন্ধ্ কর্ দিজীএ"

ঘরে প্রবেশ করিলেন হিন্দুস্থানী এক ভদ্রলোক ; বেশ মোটাসোটা চেহারা ; পরণে হাফপ্যাণ্ট্ আর গায়ে ছিটের হাফ-সার্ট। বয়স ছয়ত্রিশ সাঁইত্রিশ হইবে।

"পণ্ডিতজী হামার বদলি বন্ধ কর্ দিজীএ"

জোড় হাতে ভদ্রলোক আমার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। আধা হিন্দি আর আধা বাংলার খিঁচুড়ি ভাষায় বলিলেন, "আপনি গুরু, আমার কসুর মাপ করুন ; আমার সর্বনাশ হোয়ে যাবে। আমার ঘর, বাড়ী, গরু, ছাগল সব বিলকুল নষ্ট হোয়ে যাবে।"

কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারি না। অপরিচিত এই ভদ্রলোকের বদলি হইবার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে ! ভদ্রলোক কি থাকেন বা কোথায় চাকুরী করেন কিছুই জানি না। জ্যোতিষী-গণনা আমার কাজ ; এই ভদ্রলোক বলেন কি ?

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, "কি হয়েছে ? আমি ত আপনাকে কোনদিন দেখিনি ; কিসের বদলি ? আমি ত কিছুই জানিনে।"

তিনি আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "হাবড়া রেলমে নোকরি করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাজ করেন ? মাইনে কত ?"

কপালে করাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "গোলামীর কাজ ; কেলার্কের কাজ করি ; তলব আশি টাকা মিলতা।"

আমি বলিলাম, "তারপর আপনাকে বুঝি অন্যত্র বদলি করে দিয়েছে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুরুজী, আমার কুছ কসুর নেই ; আমাকে গোরখপুর

বদলি করে দিয়েছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশ।"—ভদ্রলোকের স্বরে দারুণ হতাশার ভাব।

আমি বলিলাম, "বেশত ভালই হ'ল, নিজের দেশে থাকতে পাবেন।"

ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "এই ত আমার দেশ আছে! আমি চৌদ্দ বরছ বাঙালী আছি। হায়, আমার নসিব!"

আমি বলিলাম, "তবুও নিজের দেশ; বাংলার আবহাওয়া কি আপনার সহ্য হয়?"

তিনি বলিলেন, আলবত পণ্ডিতজী! আমার দেশ আগ্রা জেলা ত আমি ভুলে গেছি। আমি ত বিলকুল বাঙালী বনিয়া গেছি। আপনি বাক্য দি জীএ; আপকা বাত্ আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।"

আমি বলিলাম, "উঠে বসুন, আমি কি করতে পারি বলুন।"

ভদ্রলোক আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "গুরুজী, আপকা অসাধ্য কাম কুছ্ নেই! আমি জানি।"

আমি বলিলাম, "রেলওয়েতে কাজ করেন, এমন কোন বড় অফিসারের সঙ্গে ত আমার আলাপ-পরিচয় নেই। আমার হুকুমে ত আপনার বদলি বন্ধ হবে না।"

তিনি বলিলেন, "আপনার হুকুমে সবই হয়; অতুলবাবুর বদলি আপনি ত বন্ধ করে দিলেন।"

মনে পড়িল, অতুলবাবু নামে এক রেলওয়ে-কর্মচারীর কথা! ভদ্রলোককেও এই রকম গোরখপুর না ভাগলপুর কোথায় বদলি করিয়া দিয়াছিল। ভদ্রলোক আমাকে কোষ্ঠী দেখাইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, চেষ্টা করিলে তাঁহার সফল হইবার আশা আছে।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে বলিলাম, "দেখুন, অতুলবাবুর ব্যাপারে

আমার কোন হাত নেই ; ভদ্রলোকের কোষ্ঠী দেখে তাঁকে ভরসা দিয়েছিলাম ।”

তিনি বলিলেন, “পণ্ডিতজী ! আমাকে ফাঁকি দিবেন না ; আমাকে কিরপা করতে হোবে ; আমি আপনার নোকর হোয়ে থাকব । বাড়ীঘর করেছি, গোরু-বাছুর, ছাগল—এ সবের কি হোবে ? আশি রূপেয়ায় বিদেশবিলাতে কি হোতে পারে ?”

আমি বলিলাম, “চৌদ্দ বছর, এক জায়গায় চাকুরি করে আপনার এ দেশের উপর বেশ মায়া জন্মে গেছে দেখছি ; বাড়ীঘর সবই করে নিয়েছেন ।”

তিনি বলিলেন, “সবই গুরুজী আপকা কিরপা ! পঁচিশ রূপেয়াসে আজ আশি রূপেয়া হয়েছে ! মা কালীর দোয়ায় সবই হোয়েছে ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ বড় অন্যায়, চৌদ্দ বছর পরে হঠাৎ এ রকম বদলি করে দেয় ?”

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, “দেয় বই কি ! কেউ চুকলি করেছে । নতুন সায়েব এসেছে ; বড় কড়া আদমী । আচ্ছা বলিয়ে, মালগুদামে চুরি করবার কোন দ্রব্য আছে ? তলব ত আশি রূপেয়া !”

আমি বলিলাম, “সাহেবকে ধরুন, চেষ্টা-চরিত্র করে দেখুন ; বদলি বন্ধ হতে পারে ।”

তিনি বলিলেন, “তার কি বাকী রাখছি ? সব ঝুটা দেশী সায়েব,—অনেষ্ট বন্ গিয়া ! দেড় হাজার রূপেয়া তলব মিল্‌নেসে আমিও অনেষ্ট বন্‌তে পারি ।”

আমি বলিলাম, “কি আর করবেন, অদৃষ্টে যা আছে ঘটবে !”

তিনি বলিলেন, “দেশী সায়েব লোক এসেত আমাদের নসিব খারাপ করে দিয়েছে ! বড় বড় জাত ইংরাজ সায়েব কত দেখেছি ! কাজ করে সুখ ছিল ! চুরি কি বলছেন গুরুজী ? তাঁরা দু-চারশো রূপেয়াকো

কুছ পরোয়া করত না। তাঁরা সব গেছে; আমাদের নসিবও ভেঙ্গে গেছে।"

আমি বলিলাম, "আগেত শুনেছি বেশ কড়াকড়ি ছিল।"

তিনি বলিলেন, "কাজের কড়াকড়ি ছিল; কোন গলতি ছিল না। উপরি পাওনা ছিল, কাজও ঝটপট হোয়ে যেতো।"

আমি বলিলাম, "আপনার জন্মপত্রিকা এনেছেন?"

তিনি বলিলেন, "গুরুজী, আমার জন্মপত্রিকা নেই! আপনি থাকতে আমার জন্মপত্রিক সে কি জরুরত আছে?"

আমি বলিলাম, "এখন তুলালগ্ন, তুলারাশি; শনি আপনার খারাপ করছে।"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন; হাবড়ার এক যোশী শনি-দেবকো প্রসন্ন করবার জন্যে আমার কাছ থেকে পঁচিশ রূপায়া লিয়েছে; কুছ কাম নেই হোয়েছে।"

আমি বলিলাম, "কালীবাড়ীতে পূজো দিয়ে দেখুন। আর আপিসে তদ্‌বির করুন।"

তিনি বলিলেন, "তাও করেছি; হায় মা কালী! আমি ত বাঙালী বনিয়া গেছি; মছলি, মাংস, ডিম সবই খাচ্ছি। কালীঘাটমে পাঁঠা দিয়েছি; তবু দয়া হোবে না মা!

ভদ্রলোক মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। আমিও কোন রকমে ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম।

তাঁহাকে বলিলাম, "দেখুন, এবার নীল অপরাজিতা ফুলের ডালি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে দিন, উপকার হ'তে পারে।"

তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; "গুরুজী, আপনার কিরপা হোলে সবই হোবে; আমি আপনার নোকর হোয়ে থাকব।"

তাঁহাকে বলিলাম, "আজ মঙ্গলবার এখুনি দক্ষিণেশ্বর যান।"

তিনি যেন কৃতার্থ হইয়া বিদায় লইলেন; মছলি, মাংস, ডিম-ভোজী বাঙালী আমি কালীমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলাম, "বেচারীকে দয়া কর।"

"আমার গলার স্বর বসে গেছে।"

সুদর্শন প্রৌঢ় আসিয়া প্রবেশ করিলেন; নিতান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক; বেশ পরিপাটি পোশাক পরিচ্ছদ; সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বলিয়াই মনে হইল।

"ভট্‌চার্যি-মশাই, আপনার নাম শুনে এলাম; গলার স্বর আমার বসে গেছে; এটা আমার পেশা। আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

তাঁহার গলার স্বর ভারি হইয়া গিয়াছে; বিকৃত বলিলেও চলে। কিন্তু স্বরটা পেশায় কি সাহায্য করে, বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান করিলাম, সম্ভবতঃ ভদ্রলোক কোন কলেজের লেকচারার হইবেন; তাঁহাদেরও একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়; কিন্তু কোন অধ্যাপকের ত কোনদিন গলা ভাঙ্গিতে দেখি নাই; অভ্যাস হইয়া যায়! কুড়ি-ত্রিশ বৎসর একটানা বক্তৃতা দিয়াও আমাদের সন্দীপ-ভায়া এখনও কেমন মিষ্টি-মধুর স্বরে কথা বলে!

ভদ্রলোককে বলিলাম, "আপনি বুঝি কোন কলেজের অধ্যাপক?

তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "না, না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিংবা হতেও পারে না।"

আমি বলিলাম, "তাহলে কি আইন-ব্যবসায়ী?"

তিনি বলিলেন, "না, আমি একজন গায়ক; গানই আমার পেশা। আজ ছ'মাস গলা একদম বসে গেছে; সুরই আসে না।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার কবরেজ দেখিয়েছেন? তাঁরা কি বলেন?"

তিনি বলিলেন, "ডাক্তার-কবরেজ দেখাতে বাকী রাখিনি; আমার বাড়ীতেই ডাক্তার রয়েছে।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তারীতে কোন ফল হ'ল না? কোন বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

তিনি হাসিলেন, "দেখিয়েছি বই কি! ওষুধপত্র, ইন্‌জেক্‌সন, রেডিয়ম-ট্রীট্‌মেণ্ট—কিছুতেই কিছু হয় নি; দেখুন, ওই সামান্য ঊনিশ-বিশ।"

আমি বলিলাম, "কবিরাজীতে উপকার হ'তে পারে; ব্রাহ্মী-রসায়ন-গোছের কোন ওষুধ ব্যবহার করে দেখেছেন কি? তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।"

ভদ্রলোক ভাঙ্গা গলায় হাসিয়া উঠিলেন, "তাইত খাচ্ছি!"

আমি বলিলাম, "কেন, তাতে কি কোন ফল হয় নি? স্বরভঙ্গে কবরেজী ওষুধ বেশ ফল দেয় বলে শুনেছি।"

তিনি বলিলেন, "যখন অদৃষ্ট ভেঙে যায়, তখন কোন ভাঙাই সারে না।"

আমি বলিলাম, "তা অবশ্যি ঠিক; কিন্তু আপনার বয়স ত এমন কিছুই হয় নি!"

তিনি একখানি কোষ্ঠী আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমার বয়স ষাটের উপর হয়েছে; আর কত দিন চলে? তেরো বছর বয়স থেকে এগলার উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে: তারও একটা সীমে আছে; বেচারা আর কি করবে?"

ভদ্রলোক সুরসাধক শিল্পী; সম্ভবতঃ তেরো বৎসর বয়স হইতে সঙ্গীত চর্চা সুরু করিয়াছেন। তাহার পরিচয় দিলেন। বিস্ময়-বিমূঢ় হইলাম।

আমি বলিলাম, "চেষ্টা করতে হবে ; আপনার চেহারায় এত বয়স বলে মনে হয় না।"

তিনি বলিলেন, "খুব নিয়মে চলেছি সারাটা জীবন ! কিন্তু সময়ের নিয়ম আমাদের ভাঙতে হয় ; ঠিক-সময়ে খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে উঠেনা ; রাত-জাগারও বিরাম ঘটে না। এতে কি শরীর থাকে ?"

আমি বলিলাম, এখন বয়স হয়েছে ; ধরাবাঁধা নিয়মে চলতে হবে বই কি ? রাত জাগা ছেড়ে দিন্।"

তিনি বলিলেন, "ছেড়ে ত দিয়েছি ; কিন্তু আমাকে ছাড়ে কই ? বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন, ডাক পড়ল ; একের পর একের গান চলতে লাগল ; আমার পালা পড়ল রাত দু'টোয়।"

আমি বলিলাম, "এবার বন্ধ করে দিন ; কিছুদিন বিশ্রাম করে ওষুধপত্র ব্যবহার করুন, ভাল হয়ে যাবেন !"

তিনি বলিলেন, "বন্ধ ত আপনি হয়ে গেছে ; ছ'মাস গলা খুলতে পার্‌ছি নে। আপনি কোষ্ঠীটা দেখুন।"

কোষ্ঠীটা দেখিলাম ; বলিলাম, "দ্বিতীয়ে বাক্‌স্থানে নীচস্থ শুক্রের সঙ্গে কেতু রয়েছে : এখন আবার কেতুর সঙ্গে শুক্রের অন্তর্দশা চলেছে। তাতেই এমন খারাপ হয়েছে।"

তিনি বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়, অনেককে কোষ্ঠী দেখিয়েছি কি না ? এই শুক্র কেতুই আমায় মেরেছে ; আর একদম মেরেও ফেলবে !

আমি বলিলাম, "এত ঘাবড়ালে চলবে না , আমার মনে হয়, রোগটা সেরে যাবে।"

তিনি বলিলেন, "কি দেখে বলছেন ?"

আমি বলিলাম, "শনি এখন ঐ শুক্র-কেতুর জায়গায় রয়েছে ; শনিটা দু'তিন মাসের মধ্যেই সরে যাচ্ছে।"

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কথায় একটু আশা পাচ্ছি; গলাই আমার সব; বড় সংসার, আমার এই পেশায়ই সব চলে। বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি; সত্যি বলুন, আমার গলা কি আবার ফিরে পাব? কোন প্রতিকার থাকলে বলুন!"

আমি বলিলাম, "কোন কিছু করে দেখেছেন কি? হীরে, কিংবা ক্যাটস্-আই?"

তিনি বলিলেন, "ধারণ করে দেখেছি: আমার এক বন্ধু জ্যোতিষী ভুবনেশ্বরী ও ছিন্নমস্তার পূজোয় সাত আটশো টাকা খরচ করিয়েছেন, তাতেও কোন ফল হয় নি।"

আমি বলিলাম, "তা হলে দেখছি, সবই করা হয়ে গেছে! আমি আর কি করতে পারি!"

তিনি বলিলেন, "আপনার নাম অনেক দিন থেকেই শুনেছি: সেদিন আমার এক বন্ধু জোর ক'রে বললে, আপনিই আমায় ভাল করতে পারবেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ রকম কোন শক্তি আমার নেই; আমি কোন ঈশ্বরীরই পূজোটুজো করিনে কিংবা কবচ-মাদুলিও দিই না। সহজ কতকগুলি উপায় বলে দি, তাতে কারো উপকার হতে পারে! নীলার বদলে আমি নীল রঙের ফুল ব্যবহার করতে বলি, সোনালী আভার মুক্তোর বদলে চাঁপাফুল—।

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার বন্ধুটি তা-ই বলছে! কিন্তু এতে কি উপকার হয়? আমার জ্যোতিষী বন্ধু ত এসব শুনে হেসেই অস্থির!"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "কি করব বলুন, তিন চার রতি নীলার দাম কম হ'লেও একশো-দেড়শো; আর হীরের দামটা ভাবুন। গরীব লোকেরা এসব পাবে কোথায়?

তিনি বলিলেন, "কিন্তু ঋষিরা ত এসবই ব্যবস্থা করে গেছেন।"

আমি বলিলাম, "ঋষিদের আমলে হীরে জহরত, মণি-মাণিক্যের অভাব ছিল না ঃ আর তাঁদের ব্যবস্থা রাজ-রাজড়াদের জন্যে। পঁচিশ-টাকা মাইনের কেরাণী, সে হীরে-জহরত কেনার টাকা পাবে কোথা ? তিনিও সহানুভূতির সুরে বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছেন।"

আমি বলিলাম, "তারপর পূজো, যাগযজ্ঞ, হোম! তার খরচ যোগাবার মত সামর্থ্য ক'জনের আছে ? এইত সেদিন কোন এক জ্যোতিষী পঁচাত্তর টাকা মাইনের এক কেরাণীকে গ্রহযাগের জন্য সাড়ে সাতশো টাকার এক ফর্দ দিয়েছিলেন ঃ গরীব বেচারী আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ে!"

তিনি বলিলেন, "তাইত হয় পণ্ডিতমশাই, তাই বলে কি প্রতিকার বন্ধ থাকবে ? শাস্ত্রে যা আছে, তা অবশ্য করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "ঋষিরা ফুলের কথাও বলেছেন ঃ কোন্ দেবতা কোন্ রঙের ফুলে তুষ্ট, তাও বলেছেন। রঙের একটা মাহাত্ম্য আছে।"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে! সব রঙ সব সময় পছন্দ হয় না। মাথা ধরলে ফাঁকা মাঠে ঘন সবুজ রঙটা যেন আরাম দেয়!"

আমি বলিলাম, "এর মধ্যেই রহস্য লুকানো আছে! ভোরবেলা সূর্য যখন উঠে, ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলেও অনেক রোগ সারে, স্বাস্থ্য ভাল হয়! সূর্যের স্তোত্র পড়েছেন ?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ পড়েছি, কৃষ্ণের ছেলে শাম্বের কুষ্ঠরোগ এই ক'রে ভাল হয়েছিল।"

আমি বলিলাম, "সব ব্যবস্থাই ঋষিরা করে গেছেন! ফুলের ব্যবস্থাটা নতুন নয়!"

তিনি বলিলেন, "তাহলে আমায় একটা ব্যবস্থা দিন।"

আমি বলিলাম, "ভোরবেলা উঠে সূর্যকে নমস্কার করবেন; ব্রাহ্মী-রসায়ন ত খাচ্ছেন বলছেন ঃ এরূপ কোন ওষুধ খেয়ে যান ঃ উপকার পাবেন।

ভদ্রলোক বলিলেন, "এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে—আমি ভাল হয়ে উঠব। আমার গলা ফিরে পেলে আপনাকে আমার গান শুনিয়ে যাব; আশীর্বাদ করুন।"

ভদ্রলোক আমার নিষেধ সত্ত্বেও পায়ের ধূলা লইলেন। তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিলাম, "আপনি নিশ্চয়ই আপনার গলা ফিরে পাবেন।"

মাসখানেক পরে আমার বাড়ীতে সেই সুরশিল্পীর গান শুনিতে বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই সমবেত হইয়াছিলেন।

"ওগো শুনছ, ওবাড়ীর বৌমা বড় কষ্ট পাচ্ছে।"

অনবরত লিখিয়া চলিয়াছি; শুনিবার মত অবসর আমার নাই। হয়ত তেল নাই, কিংবা চাল নাই; বাজারে যাইতে হইবে। মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া উঠি। দুই-তিনবার গৃহিণীর কণ্ঠ কাণে আঘাত করার পর তাঁহার দিকে উৎকর্ণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকাইলাম।

"ওবাড়ীর বৌমা বড় কষ্ট পাচ্ছে; কাকীমা এক্ষুণি তোমার কাছে আসছেন।"

"কেন কি হয়েছে?"

ওবাড়ীর কাকীমা, অর্থাৎ পাশের বাড়ীর গৃহিণী। আমাদের দুই বাড়ীতে ছেলে-মেয়ের ঝগড়াঝাঁটি মারামারি লইয়া প্রায়ই কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তাহাদের প্রতি গৃহিণীর এইরূপ সহানুভূতির কারণ বুঝিলাম না।

"বউটির ছেলে হবে কি না ; আজ তিনদিন যন্ত্রণায় ছটফট করছে ঃ কোন সুরাহা হচ্ছে না।"

"দাই ডেকেছে ? ডাক্তার দেখিয়েছে ?"

"সবই দেখানো হয়েছে ; কাল হাসপাতালে দিয়েছে। ডাক্তার বলছে, ছেলে উলটে আছে ; অপারেশন করতে হবে।"

"আমি কি করতে পারি ! ওদের ত টাকা-পয়সার অভাব নেই।"

"না, গো না, একটা শিকড়-মাদুলি, কিংবা জলপড়া-টলপড়া কিছু দিলে হয় না ?"—গৃহিণীর স্বর ব্যথিত !

বুঝিলাম, মেয়েদের কষ্ট মেয়েরাই বুঝে। যে বউ শাশুড়ীর সঙ্গে একজোট হইয়া আমারই ছোট মেয়েকে উপলক্ষ করিয়া গৃহিণীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করিয়াছে, আজ তাহারই যন্ত্রণা কল্পনা করিয়া গৃহিণী ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। জ্যোতিষীর দরবারে অনেকেই আসেন ; প্রতিকারও বলিতে হয় ঃ বিশ্বাসী গরীব দুঃখী নাছোড়বান্দা হইয়া কাঁদিয়া পড়িলে গ্রহের দোষ কাটাইবার জন্য শিকড় কিংবা ঠাকুরের নির্মাল্যও দিতে হয়। গৃহিণীর বিশ্বাস, ইহাতে উপকার হয়। সেইজন্য ছাদে গিয়া কাকীমাকে স্বামীর অব্যর্থ গুণপণার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহাকে বলিলাম, "নিশ্চয়ই তুমি কিছু বলে এসেছো ; কাকীমা ত আমাদের ঘরে আসেন না।"

তিনি বলিলেন, "লোকের বিপদ্-আপদ আছে ঃ মিছামিছি গিন্নী-বান্নী বুড়ো মানুষ কাজ না থাকলে তোমার কাছে আসতে যাবেন কেন ?"

আমি রসিকতা করিয়া বলিলাম, "বিপদের সময়ই রামনাম ! কিন্তু ঝগড়াঝাঁটির বেলা ত মনে থাকে না ; তখন তাঁর বাক্যি শুনলে ত কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "বিপদের সময় ওসব কথা মনে রাখতে নেই। আহা, বউটি বড় ছট্‌ফট করছে! ধরে রাখা যাচ্ছে না।"

আমি বলিলাম, "হাসপাতালে দিয়েছে। ভয় নেই, সেখানে সব বড় বড় ডাক্তার রয়েছে ঃ তারাই ব্যবস্থা করবে। দরকার হয় পেট চিরে—।"

আমার কথায় বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওসব কথা মুখে আনতে নেই ; আমার ঘরেও মেয়ে রয়েছে। একটা কিছু দাও।"

ইতিমধ্যে কাকীমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘোমটা টানিয়া তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি থাকতে বউটা মারা পড়বে ?"

আমি বলিলাম, "ব্যস্ত হবেন না ; ডাক্তারেরাই ভাল ব্যবস্থা করবেন। আমি এমন কিছুই জানিনে, যাতে করে কোন উপকার করতে পারি !"

কাকীমা কাঁদিয়া ফেলিলেন ; আমার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি বউটাকে বাঁচাও! কাটাকুটি এ আমার ভাল লাগেনা।"

এইরূপ অবস্থায় আর তর্ক চলে না ; কৌটা হইতে ঠাকুরের নির্মাল্য বাহির করিয়া কাগজে মুড়িয়া কাকীমার হাতে দিলাম ঃ তাঁহাকে বলিলাম, "এটা সূতোয় বেঁধে বউমার হাতে কিংবা গলায় পরিয়ে দিন গে ; বিপদ্ কেটে যাবে।"

এমন করিয়াই একের পর এক আসে ; কিছুই জানিনা বলিলেও নিস্তার নাই। বিপন্ন মানুষের অন্ধবিশ্বাস ! মাটির দেবতাও কথা বলে ! বউমা নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিয়াছে !

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ !!

বাহিরে গিয়াছিলাম ; বাড়ী ফিরিয়া দেখি অভূতপূর্ব দৃশ্য !

গৈরিক পাগড়ি এক পাঞ্জাবদেশীয় জ্যোতিষী আসনে বসিয়া আছেন; আমারই স্ত্রীপুত্র কন্যারা করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। এই রকম জ্যোতিষী বা আধা-সন্ন্যাসী প্রায়ই কলিকাতায় ঘুরিয়া বেড়ায়; হরিদ্বারের সন্ন্যাসী বলিয়া ইঁহারা পরিচয় দেয়। মুখের দিকে তাকাইয়া অতীতের দুই-একটি কথা বলিয়া স্তম্ভিত করিয়া দেয়!

গৃহিণী বলিলেন, "বাবাকে প্রণাম কর! ইনি হরিদ্বার থেকে এসেছেন।"

"আমার সৌভাগ্য! কিন্তু ব্যাপার কি?"—অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণাম করিলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ব্যাটা, তোমার বড় সৌভাগ্য আছে! লক্ষ্মী এসেছেন! আমার গুরুজী দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ! সে ত সহজে পাওয়া যায় না।"

"ব্যাটা গুরুজীর কির্‌পায় সবই হয়; তুমি কালীমায়ীকা সেবক আছে। এই দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আমার গুরুজী পাঠিয়ে দিয়েছেন।" তিনি সত্যই তাঁহার ঝুলির মধ্য হইতে কাপড়ে জড়ানো একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বাহির করিলেন।

দেখিয়া পুলকে স্তম্ভিত হইলাম; শুনিয়াছি, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ঘরে রাখিলে মানুষ লক্ষ্মীর কৃপা পায়; সে কোটিপতি হইতে পারে। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা! লোভ হইল; কিন্তু ভিতরে জাগিল শঙ্কাতুর ভাব! ইহার মূল্য আমি কোথায় পাইব? সাধুকে বলিলাম, "আমরা গরীব মানুষ, এর মূল্য দেবার শক্তি আমাদের নেই।"

"মূল্য কি রে ব্যাটা? এ কি মূল্য দিয়ে পাওয়া যায়? গুরুর কির্‌পা হয়েছে; বৈশাখ মাসে তোমায় হরিদ্বার যেতে হবে।" সাধু বলিলেন।

"হরিদ্বার? সেত আমার কাছে স্বপ্ন! বাড়ীর কাছে বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর; তাও সাত আট আনা বাজে খরচ হবে বলে যেতে পারিনে।"

"চিন্তা কি ব্যাটা। সব হোয়ে যাবে! গুরুজী যখন কির্‌পা করেছেন।" তিনি থলি হইতে একখানি ছবি বাহির করিলেন; তাহাতে এক সাধু-মণ্ডলের ছবি; মধ্যভাগে এক বৃদ্ধ সাধু রহিয়াছেন।

সাধু বলিলেন, "ওই আমার গুরুজী; ব্যাটা প্রণাম কর; তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হোবে।"

আমি বলিলাম, "এখন আমায় কি করতে হবে।"

তিনি বলিলেন, "কিছুই না! অতিথি নারায়ণ; আগে ভোজন করিয়ে দে। পয়সা-কড়ি লাগবে না; কামিনী-কাঞ্চন—সে ত আমরা স্পর্শ করি নে!"

ইতিমধ্যে সাধুর আহারের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। সাধু একখানি তাম্রপাত্রে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ রাখিয়া আমার হাতে দিলেন। "ধর ব্যাটা, গুরুজীর আশীর্বাদ! মনে রাখিস্, বৈশাখমাসে হরিদ্বার যেতে হোবে।"

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ হাতে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। একখানি জল চৌকীর উপরে শঙ্খটি রাখিয়া দিলাম। আগন্তুক ভোজনে বসিলেন; পরিপাটী করিয়া তাঁহাকে সমস্ত সাজাইয়া দেওয়া হইল; ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গিয়াছিল; সাধুর ভোজন দেখিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলাম। বারবার তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জন দেওয়া হইল। আর ভাত নাই; গৃহিণী বলিলেন, "বাবা রুটি দেবো?"

সাধু বলিলেন, "দে মা, বড় ভোখ্ লেগেছে! মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী আছে! কি মিষ্টি ব্যঞ্জন!"

ছেলে-মেয়েদের জলখাবারের রুটিও সাঙ্গ হইল। সাধু ভোজন-পর্ব সমাধা করিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর বলিলেন, "ব্যাটা, আমরা ত কামিনী-কাঞ্চন, টাকা-পয়সা ছুঁই না; এক কাজ কর, হরিদ্বারজীকা দুটো রেল-টিকিটের দাম দে।"

আমি সবিনয়ে বলিলাম, "সে ত অনেক টাকা! আমার কাছে এখন দু'এক টাকার বেশী কিছুই নেই।"

তিনি বলিলেন, "আমি বসে আছি; বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার লিয়ে আয়! এমন চীজ্ আর পাবিনে। তোর বড় সৌভাগ্য; লক্ষ্মীমায়ীকা কির্পা।"

আমি বলিলাম, "এখন আমাকে ধার দেবে কে? তেমন বন্ধুবান্ধবও আমার নেই?"

সাধু বলিলেন, "তোরই মঙ্গল হবে ব্যাটা! অতিথি নারায়ণের ভোজন হ'ল; এবার দক্ষিণা না দিলে সব নিস্ফল হোবে! রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা মালুম আছে?"

রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প জানি! এ সাধু বলে কি? সবিনয়ে বলিলাম, "আপনি জানেন, আমি গরীব! কিছুই দেবার শক্তি আমার নেই। দক্ষিণা দিতে হবে। আচ্ছা দিচ্ছি!" এই বলিয়া চারি আনা পয়সা তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম।

তিনি বলিলেন, "আরে রাম, রাম! টাকা-পয়সা আমরা ছুঁইনে।"

আমি বলিলাম, "এই ত হরিদ্বারের ভাড়া চেয়েছিলেন!"

সাধু হাসিয়া বলিলেন, "সে ত হরিদ্বারের ভাড়া আছেরে ব্যাটা! আচ্ছা ঐ ঘড়িটা দে।"

টেবিলেরও উপর একটি টাইমপিস্ ঘড়ি ছিল। সাধু বলিলেন,

ওটাই দিতে হবে।" আমি বলিলাম, "এক বন্ধু দিয়েছেন; ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ আছে; সময় দেখতে হয়।"

"ব্যাটা তুই আচ্ছা আদমী আছিস্।" এই বলিয়া তিনি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ তুলিয়া থলিয়ার মধ্যে রাখিলেন। আমাকে বলিলেন, "ব্যাটা, গুরুজীর আদেশ, দক্ষিণা লইতে হোবে। না হ'লে সব নিষ্ফল হোয়ে যাবে; তোর অমঙ্গল হোবে। গুরুজীর আদেশ হ'লে আবার আসব।"

সাধুটি চলিয়া গেলেন! দক্ষিণাবর্ত শঙ্খও অদৃশ্য হইল। দুঃখ হইল বই কি? "হাতেতে পাইয়া নিধি গেল দৈবদোষে।"

গৃহিণী বিরক্ত হইলেন: "এতই ঘড়ির মায়া!"

# অশরীরী

বহুদিনের পুরাতন ঘটনা। একজন যুবক ঘরে প্রবেশ করিল। পাতলা ছিপছিপে গড়ন ; চুলগুলি এলোমেলো ; বয়স তেইশ-চব্বিশ হইবে ; গায়ের রঙ ফরসা বলা চলে। তাহার চোখ দুইটি অস্বাভাবিক চঞ্চল ; সন্দেহাতুর তাহার দৃষ্টি।

আপনি...বাবু ? নমস্কার !

হ্যাঁ, আমিই।

আমি ভেবেছিলাম, বুড়ো-টুড়ো কোন ফোঁটাকাটা পণ্ডিত-টণ্ডিত হবেন ! যাক্, আপনাকে পেয়ে গেছি ; আমার একটু কাজ আছে।

যুবকটিকে বসিতে বলিলাম। তাহার উস্কখুস্ক চেহারার মধ্যেও একটা আকর্ষণীয় আভিজাত্য ছিল ; দেখিলে কেমন যেন একটা মায়া হয়।

যুবকটি একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার কাছেই বসিল। তাহার হাতের সিগারেটের টিন আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন,—আমি বড্ড বেশী স্মোক্ করি কি না !"

আমি একটি সিগারেট লইয়া বলিলাম, "কোন বাধা নেই ; আপনি ধরান।"

সে একটি সিগারেট ধরাইল ; কিন্তু তাহার দৃষ্টি বড় চঞ্চল, এদিকে-ওদিকে তাকায়, যেন কাহারও উপস্থিতির একটা আশঙ্কা তাহার মনে জাগিতেছে। দরজার কাছে গিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া আবার আসিয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "কারো কি আসার কথা আছে ?"

আমার কথায় যুবকটি যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিল ; তাহার মুখে শঙ্কাকুল ভাব। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হকচকিয়া উঠিয়া বলিল, "কেউ কি আমার খবর করে গেছে ?"

আমি বলিলাম, "না, আজ এখানে আর কেউ আসে নি।"

যুবকটি বলিল, "যাক্, বাঁচা গেছে; বড় মুশকিলে ফেলেছে আমাকে!"

আমি বলিলাম, "মুশকিল আর কি? হয়ত পৌঁছতে একটু দেরী হচ্ছে! তার জন্য চিন্তা কি? অপেক্ষা করুন, হয়ত এখুনি এসে পড়বে।"

যুবকটির মুখে ম্লান হাসি; চিন্তাকুল বিমর্ষ তাহার সুন্দর মুখখানি করুণার উদ্রেক করে! এই বয়সে এরূপ হওয়া ত উচিত নয়!

সে পকেট হইতে একখানি চিরকুট বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "এই রাশিচক্রটা দেখুন ত?"

রাশিচক্রে চোখ বুলাইয়া বলিলাম, "কোষ্ঠীটা ত মন্দ নয়, কি জানতে চান? এখন ত শনির দশা চলছে।"

"হ্যাঁ, শনির দশাই বটে! জ্যোতিষে আছে না!—দুঃখবাদী শনি,—ছায়ার নন্দন,—যমের অগ্রজ শনি! চোখে জল ঝরায়, মানুষকে পাগল ক'রে ছাড়ে। আমাকে শনিতে পেয়েছে। আমি অনেক কিছুই জানতে চাই।"—যুবকটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "কি জানতে চান বলুন!"

যুবক বলিল, "আচ্ছা, আপনি আত্মায় বিশ্বাস করেন?"

আমি বলিলাম, "বিশ্বাস করি বই কি?"

যুবকটি বলিল, "যে মরে গেছে, সে কি আসতে পারে? সে কি আবার দেখা দিতে পারে?"

"শুনেছি বটে কেউ কেউ মৃতব্যক্তির আত্মাকে দেখতে পেয়েছেন! কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ফিরে আসা বলা চলে না; মনের ভ্রান্তিও হতে পারে।"—অবান্তর কথা আসিয়া গেল দেখিয়া আমি এইরূপ উত্তর দিলাম।

যুবকটি বলিল, "মনের ভ্রান্তি নয়, আমি নিজেই দেখেছি ; এখনও দেখি। সে ফিরে এসেছে! কিন্তু সত্যিই সে মরে গেছে কি না, তাও ঠিক করতে পারছি নে।"

"কে সে? আপনার কোন নিকট আত্মীয় বুঝি?"—তাহাকে প্রশ্ন করিলাম।

তাহার মুখে আবার ম্লানহাসি দেখা দিল ; সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল ; বড় মর্মান্তিক—তাহার চোখ-মুখের অবস্থা! কোষ্ঠী দেখাইতে আসিয়া যুবকটি জীবনের কোন বিশেষ মর্মান্তিক বিয়োগব্যথার প্রসঙ্গ তুলিয়া কি কাতর হইয়া পড়িল? তাহাকে বলিলাম, "দেখুন, কার কথা আপনি বলছেন, বুঝতে পারছিনে ; আর তার মৃত্যু হয়েছে কি না সে বিষয়ে কেনই বা সন্দেহ প্রকাশ করছেন? কেউ কি নিরুদ্দেশ হয়েছে?

এইবার যুবক উত্তর দিল, "নিরুদ্দেশ? তা হতে পারে! কিন্তু মৃতের আত্মাই ত আসে : বেঁচে থাকলে কি সে এমন করে আসে?"

আমি বলিলাম, "তার জন্মকুণ্ডলী দেখে সে বিষয়ে একটা অনুমান করা যেতে পারে।"

যুবকটি বলিল, "নেই, তার কোন জন্মকুণ্ডলী নেই ; তার কিছুই নেই ; তার কোন পরিচয়ই জানিনে। অথচ সে আমার নিতান্ত আপনার জন হয়ে উঠেছিল! জানতে চান, সে কে? আমারই মত একজন সে। তার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল বড় নিকট, বড় মধুর—বড় সুন্দর সম্পর্ক! তার জের এখনও চলেছে। সে মরে গেছে ; তবুও আমাকে ছেড়ে যায় নি।"

ভাবিলাম, হয়ত কোন ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী হইবে। অকাল-মৃত্যু সম্ভবতঃ ইহাদের মিলনের পথে ছেদ টানিয়াছে। এইরূপ কতই ঘটে! প্রেমে পাগল দুই চারিজনকে যে বিশেষ ভাবে জানি।

তাহাদের পাগলামি দূর হইয়াছে, প্রথম বয়সের প্রেমের ডোর বিবাহের ফাঁস পরাইয়াছে ; আত্মীয়স্বজন মাতাপিতা কেহই সেই পবিত্র প্রেমে বাধা দিতে পারেন নাই ; অথচ তিনচারি বৎসর পরেই দেখা গেল প্রেমিক বন্ধু বর্তমানের স্বামী ছয় সাত মাসের শিশুসহ পূর্বের প্রেমিকা বর্তমানের আইনতঃ পত্নীকে ছাড়িয়া অন্যের প্রেমের ফাঁস স্বেচ্ছায় পরিয়াছেন !

যুবকটি বলিতে লাগিল, "নিরুদ্দেশ, আত্মহত্যা না ইচ্ছামৃত্যু ?—বুঝবার কোন উপায় নেই। আমার মনে হয়, আমিই তাকে হত্যা করেছি ; গলা টিপে মেরে ফেলেছি।"

সে উঠিয়া দাঁড়ায়। দরজার বাহিরে আবার উকিঝুঁকি মারে। তাহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হই ! ছেলেটি কি শেষে পাগল হইবে ? তাহাকে বলিলাম, "যে চলে গেছে, তার জন্য আর ভেবে কি লাভ হবে ? এটা ত আপনার রাশিচক্র ?"

সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এটা আমারই।"

আমি বলিলাম, "আপনার কোষ্ঠী ত খারাপ নয়। এসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দিন।"

সে বলিল, "ভুলতে চাই, কিন্তু পারি কই ? সে যে আমার পিছু পিছু চলে ; সে যে একজনের জীবন মরুময় করে তুলেছে !"

আমি বলিলাম, "মনের জোর বাড়ান। এটা মানসিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। জন্মকালে লগ্নপতি চন্দ্র রাহুযুক্ত হয়ে নীচস্থ হয়েছে ; আবার ধর্মপতি বৃহস্পতিও সপ্তমে শত্রুগ্রহ বুধসহ নীচস্থ ; তাতেই মানসিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে ! এটা কিছুই নয় !"

সে বলিল, "মানসিক দুর্বলতা আমার মোটেই নেই। বরাবর পড়াশুনায় ভাল,—ফার্ষ্ট, সেকেণ্ডও হয়েছি ; স্কলারসিপ পেয়েছি ; কিন্তু এই এম. এ পড়তে গিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল ! এখানেই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা !"

আমি বলিলাম, "যে কোন কারণেই হোক্, এখন আপনার মানসিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।"

যুবক দৃঢ়ভাবে বলিল, "দুর্বলতা কোথায় দেখলেন ? মায়া, মমতা, ভালবাসা,—এগুলো কি দুর্বলতা ? তাকে আপনি দেখেন নি, দেখলে এমন কথা বলতে পারতেন না।"

প্রেমিকের চোখে প্রেমাস্পদের সবই সুন্দর ! সুন্দরী পত্নীকে ত্যাগ করিয়া কুৎসিত কালোর প্রেমে মজিতেও দেখিয়াছি ; জানিনা, মনোবিজ্ঞান কিংবা আসঙ্গ-তত্ত্ব কি বলে ! . শুধু তরুণ-তরুণী নহে, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধদেরও মতি-বিভ্রাট ঘটে।

যুবককে বলিলাম, "আচ্ছা সবই স্বীকার করছি ; কিন্তু এখন সে আর নেই ; তার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে লাভ কিছু আছে ?"

সে বলিল, "কিন্তু সে যে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না ; আমি যেখানে যাই, আমার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যায়, ট্রামে-বাসে সর্বত্র তাকে দেখা যায় ! রাত্রে ঘুমুতে দেয় না !"

ভাবিলাম, নিরুদ্দিষ্টের আত্মা সম্ভবতঃ উপদ্রব করিতেছে ; অথবা অত্যধিক চিন্তায় যুবকটির মানসিক ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়াছে !

সে উদ্বিগ্ন হইয়া হঠাৎ বলিল, "দেখুন ত আমাকে জেলে-টেলে যেতে হবে কি না !"

আমি বলিলাম, "এরকম ত কিছুই দেখি নে ; কর্কট লগ্নের তৃতীয়ে রবি, দশমে মঙ্গল ও ষষ্ঠে শনি। বেশ ভালই বলা চলে।"

যুবকটি আমার একখানি জ্যোতিষের বই নাড়াচাড়া করিতেছিল ; হঠাৎ এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, এই দেখুন,

লগ্নপো ধর্মপো নীচে রিপুযুক্তো ভবেদ্ যদি।
নেক্ষতে মৃত্যুপো মৃত্যুং কারাগারে মৃতির্ভবেৎ ॥

আমার লগ্নপতি ও ধর্মপতি নীচরাশিতে শত্রুগ্রহের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ; মৃত্যুপতি শনিও মৃত্যুস্থানকে দেখছে না ।”

আমি বলিলাম, “আপনি দেখছি, জ্যোতিষ-চর্চাও করেন। কিন্তু শুধু একটা দিক্ দেখলে ত চলবে না। রবি ও মঙ্গলে এ দোষ কেটে গেছে। এসব চিন্তা ছেড়ে দিন ; মন দিয়ে পড়াশুনা করুন।”

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; “দুজনে এক সঙ্গে এম-এ দেবো। সে বাংলায়, আর আমি ইংরেজীতে।”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবেন। এবারই উঠে পড়ে লাগুন। আপনার ভবিষ্যৎ গৌরবময় হয়ে উঠবে।”—তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলি।

“কিন্তু সে-ই এখন বাধা দিচ্ছে ; এমন করে যদি আমার পিছু পিছু চলে, আর ধরা ছোঁয়া না দেয়, তাহলে যে আমি পাগল হয়ে যাব। তার কি আত্মার শান্তি নেই ?”—হতাশার সুর যুবকের কণ্ঠে।

হঠাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল ! আত্মা আর প্রেতাত্মা ! প্রেতাত্মার উপদ্রবে একটি ছোট ছেলের জীবন কিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই মর্মান্তিক চিত্র স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। এই যুবকটিকেও সম্ভবতঃ মৃতের প্রেতাত্মা বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে ! প্রেতাত্মাকে শান্ত করিবার কোন উপায়ই আমি জানি না। আহা বেচারীর যদি কোন উপকার করিতে পারিতাম !

তাহাকে বলিলাম, “মৃতের আত্মা কোন কোন সময় উৎপাত করে শুনেছি ; কিন্তু মনের জোর বাড়ান ; এসব মানসিক দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়।”

সে বলিল, “না, না, মানসিক দুর্বলতা নয়! আপনার আমার মত সেও সত্যি ; দেখা দেয় তার অশরীরী আত্মা !” যুবকটি ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিল।

পঁচিশ বৎসর আগেকার স্মৃতিপট খুলিয়া গেল ; তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সের একটি ছোট ছেলে ! তার উপরে যখন-তখন রক্তের ডেলা ছুঁড়ে কে মারে ! বেচারী সবদিন খাইতেও পায় না ! ভাতের থালায়ও কোন কোন দিন রক্তের ডেলা পড়ে। আমার এক বন্ধু আসিয়া খবর দিলেন,—'সুবোধদের মেসে এক ভদ্রলোক থাকেন ; তার এক ভাগনেকে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তার উপর কোথা থেকে যে রক্তের ডেলা পড়ে কিছুই বুঝা যায় না ; ভৌতিক কাণ্ড ! চলুন না আজ দেখে আসবেন।' সেইদিন বিকালে বন্ধুর সঙ্গে সেই মেসে গেলাম ; জ্যোতিষ চর্চা করি বলিয়া আমার খাতিরও খুব হইল। ছেলেটির হাতও দেখিলাম ; ছেলেটির মামা বলিলেন, 'ওর মা-বাপ কেউ নেই ; তাই আমার কাছে এনে রেখেছি। এর ঠাকুর্দা ছিলেন তান্ত্রিক ; বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। দু'তিন বছর আগে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয়ে ছেলের কাছে এই নাতিটিকে চাইলেন। সব ব্যাপার আমি জানিনে ; এই নিয়ে বাপে আর ছেলেতে খুব ঝগড়াঝাঁটি হয় ; তারপর সেই তান্ত্রিক কোথায় চলে যান, কেউ কোন খবরই রাখে না। দু'তিন বৎসরের মধ্যে এই ছেলের বাবা, ভাই, বোন, সব মারা যায়। বাকী ছিল আমার বোন, এরই মা ; আজ মাস তিনেক হয় ছেলেটিকে রেখে সেও মারা গেছে। এরা সকলেই নাকি সেই বুড়ো তান্ত্রিককে রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পেত। এই ভাগনেটি প্রায় রাত্রেই ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে উঠে আর কাঁপতে থাকে ; জিজ্ঞেস করলে বলে, লম্বা লম্বা চুল-দাঁড়িওয়ালা তার ঠাকুর্দা তাকে ধরতে আসে,—ভয়ানক তার মূর্তি।' আমিও ছেলেটির মুখে সকল কথা শুনিলাম ; তাহার কথা শুনিয়া আমার মনেও আতঙ্কের সঞ্চার হইল। মনে মনে রাম, দুর্গা, কালী—প্রায় সকল দেবতারই নাম জপিতে লাগিলাম। হঠাৎ কোথা হইতে দুই তিন ডেলা রক্ত

ছেলেটির গায়ে পড়িল; ছোট ঘর; জানালাগুলি বন্ধ; সামনের দরজার দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি; অথচ রক্ত আসিল কোথা হইতে? ছেলের মামা বলিলেন, 'দু'এক দিনের মধ্যেই গয়ায় পিণ্ড দিতে যাব; দেখি তাতে উৎপাত দূর হয় কি না?' তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু দুই-তিনদিন রাত্রে আমাদের ঘুম হয় নাই; আলো নিভাইলেই মনে হইত, লম্বা লম্বা চুল-দাঁড়িওয়ালা কোন কাপালিক ধরিতে আসিতেছে!

আমার পাশে যে যুবকটি বসিয়া রহিয়াছে, তাহার কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু তাহাকে বলিলাম, "আমি ত এ বিষয়ে কিছুই জানিনে। শুনেছি কেউ কেউ এরূপ প্রেতাত্মার শান্তি করতে পারেন।"

যুবকটি বলিল, "সে প্রেত হ'তে যাবে কেন? নিষ্পাপ সে। তার বিদেহী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঃ সে ত কোন পাপ করেনি। কিন্তু আর একজন যে তারই জন্য পাগল হতে বসেছে,—মরতে বসেছে; সে কি তা দেখতে পায় না?"

কোন উত্তর খুঁজিয়া পাই না; বলিলাম, "আপনি ভাল সাধু-সন্ন্যেসীদের সঙ্গে আলাপ করে দেখুন; তাঁরা কোন উপায় বলে দিতে পারেন।"

যুবকটি বলিল, "তাঁরা ত তত্ত্বকথা শুনাবেন। তত্ত্বকথা আমি অনেক শুনেছি। আমার জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু আর একটি নারী —যার মন ফুলের মত সুন্দর,—যার হাসি ফুলের লাবণ্যকেও হার মানিয়ে দেয়, সে যে মরতে বসেছে।" যুবকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

যুবকের কথাবার্তা হেঁয়ালিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর একজনকে এই রহস্যের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। ফুলের মত সুন্দরী এক নারী! দুইজনের প্রেম একজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে! সম্ভবতঃ একজন মৃত

আর একজন জীবিত। মনে হইল, যে নারীর কথা সে বলিতেছে, সে মৃত মেয়েটির প্রতি ঈর্ষায় কাতর! তুলাদণ্ডে মাপজোঁক চলিতেছে! প্রতিদ্বন্দ্বী ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে, তবুও নিস্তার নাই!

যুবকটিকে সান্ত্বনার সুরে বলিলাম, "মেয়েটিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করুন; যে চলে গেছে, তাকে টেনে এনে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়।"

যুবক বলিল, "আপনি বুঝতে পারছেন না; এতে আমার কোন হাত নেই। তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ-ঘটানোর ব্যাপারে অবশ্য আমিই দায়ী। সুলতা তাকে ভুলতে পারছে না; তাকে চাই-ই।"

ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলাম না; সুলতার সঙ্গে যুবকটির সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলাম।

যুবকটি বলিল, "আমি বড়ই ভুল করেছিলাম; সুলতার দিকে সেদিন মোটেই তাকাইনি। একজন নীচ জাত এসে আমাদের বংশে কালি মাখিয়ে দেবে, এ চিন্তাই আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। কিন্তু তার কোন দোষই ছিল নাঃ তবুও তাকে শাসিয়েছিলাম। সুলতা যে তাকে এমন ভাবে ভালবেসে ফেলেছে, তা স্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি; আমার শাসানিতেও সে হেসে ফেলেছিল।"

যুবকের কথায় কৌতূহল বাড়িলঃ প্রকৃত ব্যাপার কি জানিতে চাহিলাম। যুবক আরম্ভ করিল, তাহার এক বন্ধুর কথা। দুই-জনেই ভাল ছেলে। একদিন কলেজের ছুটির পর সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া ছেলেটি অন্যমনস্ক ভাবে পড়িয়া যায়। এই যুবকটি তাহাকে না ধরিলে গড়াইয়া একদম নীচে পড়িয়া যাইত। সেই হইতে দুইজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

"বাড়ীতে আসে; দুজনে গল্পগুজব করি; সে আমারই মত বাড়ীর ছেলে হয়ে উঠল। সুলতা আমারই বোন; অবাধে আমরা মেলা-

মেশা করি। বন্ধুটি বেশ একটু আনমনা ভাবের ছিল; এর জন্যেই সেদিন সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিল ঃ ওই ছুঁতো ধরে সুলতা তাকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করত; তার নাম দিয়েছিল "ভোলা মহেশ্বর"। কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটে উঠত।"—যুবকের মন যেন অতীতের সুখ-স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "তারপর কি হ'ল ?"

সে বলিল, "কখন যে কি হয়ে গেল বুঝতে পারিনি; সুজয়, হ্যাঁ, আমার সেই বন্ধুটির নাম। সে প্রায়ই আসত। সুলতা বড় হয়েছে ঃ তার বিয়ের সম্পর্ক ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সুলতা হঠাৎ বেঁকে বসলে—'বিয়ে করব না।'

আমি বলিলাম, "এর জন্যে যে আপনার বন্ধুটি দায়ী, তা আপনি কি ক'রে মনে করেন ?"

সে বলিল, "না, না, সে দায়ী নয়; দায়ী সুলতা! সুলতা তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। কাকীমা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আমায় বললেন, 'বংশের মুখে চুনকালি পড়বে : অজাত-কুজাতের হাতে কি আমরা মেয়ে দিতে পারি!"

"বুঝেছি, মেয়েরাই মেয়েদের মন বুঝতে পারে। কিন্তু সুলতা কি কিছু বলেছিল ?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

যুবকটি বলিল, "সুলতা তেমন মেয়ে নয়! আর সুলতার কথা আমি তখন ভাবিনি ঃ আমার অভিজাত রক্ত তখন টগবগিয়ে ফুটছে! তবুও নিজেকে সামলে নিলাম। এমনি ছিল তার মুখখানি! সুজয়কে কাকীমার কথায় অনুযোগ করেছি ঃ সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তবুও এসেছে। শেষে একদিন আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে তাকে শাসিয়েছি ঃ সেও সেদিন থেকে আর আসে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর তার কোন খবর নিয়েছেন ?"

সে উত্তর দিল, "কয়েকদিন তাকে আর কলেজে দেখা গেল না কেমন একটা সন্দেহ হল ; তার মেসে গিয়ে শুনলাম, কয়েকদি আগে সে এ শহর ছেড়ে কোথা চলে গেছে, কেউ তার কোন খব জানে না।"

আমি বলিলাম, 'বন্ধুটি হয়ত আপনাদের মঙ্গলের জন্যই অন্য কোথাও চলে গেছে।"

যুবক বলিল, "তাই হবে। কিন্তু কোথা যাবে ? তার বাড়ীঘরে ঠিকানাও জানি নে। আমার মনে হয় কি জানেন, আমিই তাবে গলা টিপে হত্যা করে।ছ।"

যুবকটি দুইহাতে গলা টিপিয়া মারিবার মত ভঙ্গী করিল : "উ কি অসহ্য জ্বালা !" তাহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অনেক দিনের ঘটনা : যুবকটি আর ইহলোকে নাই ; সুলতাও মারা গিয়াছে। জ্যোতিষীর স্মৃতির পাতায় এমনি কত জনের অশ্রু রেখা পড়ে : হিজিবিজি, আঁকাবাঁকা,—কত অস্পষ্ট রেখা ! ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবি, কেন তাহারা জ্যোতিষীর কাছে আসে ? সান্ত্বনা ?— প্রতিকার ? কি দিতে পারে জ্যোতিষী ? অশ্রু গড়াইয়া পড়ে তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ; তাহাদের অশরীরী আত্মা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়।

———